বিজ্ঞানের গল্প

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ

শ্রীজগদানন্দ রায় প্রণীত

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্,

এলাহাবাদ

১৯২০

[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্—এলাহাবাদ।

ও

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস—কলিকাতা।

এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড্ হইতে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন

এই ছোট পুস্তকখানি বালকবালিকাদের জন্য লিখিত হইল। ইহা পড়িয়া তাহারা আনন্দ লাভ করিলে কৃতার্থ হইব।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন,
আশ্বিন, ১৩২৭।

শ্রীজগদানন্দ রায়

সৌভাগ্যবতী

শ্রীমতী রেণুকা দেবী

কল্যাণীয়াসু

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের গল্প

সূর্য্য

আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির সময়ে খুব ভোরে শিউলি ফুলের গন্ধে যখন তোমাদের বাগানখানি ভরপূর, তখন এক-বার বিছানা ছাড়িয়া বাগানে আসিয়া দাঁড়াইয়ো। বাগানের ঘাসগুলি শিশিরে-মাখা; ঘাসের উপরে দাঁড়াইলেই পা ভিজিয়া যায়। তখনো একটু-একটু অন্ধকার আছে,—সব পাখী বাসা ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। তোমরা অন্ধকারকে যেমন ভয় কর, পাখীরাও সেই-রকম ভয় করে। কেবল দূরের কদম গাছটির মাথায় দু'টা কাক "কা-কা" করিতেছে। তখনো তাহাদের গলার আওয়াজ খোলে নাই; সমস্ত রাত্রি মুখ বুজিয়া ঘুমাইয়া থাকায় তাহাদের গলার আওয়াজ তখনো আড়ষ্ট।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ ফরসা হইয়া গেল। কাঠ-বিড়ালরা চাঁপা গাছে লাফালাফি সুরু করিয়া দিল। ছাতারে পাখীদের সাত ভাই নেবু-তলায় অনাবশ্যক বকাবকি ও লাফালাফি জুড়িয়া দিল। কেবল ফিঙে রোদ পোহাইবার জন্য ঝাউগাছের মাথায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

রৌদ্র উঠিল। কি সুন্দর রৌদ্র! সোনার মত তাহার রঙ্। এখন আর সে-রকম ঠাণ্ডা নাই,—গোরু-বাছুর গোয়াল ছাড়িয়া আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। তোমাদের বাড়ীর ঝি ঘর ঝাঁট দিতে সুরু করিল এবং রাস্তায় লোক-চলা আরম্ভ হইল।

একটু আগে যে-অন্ধকার যে-স্তব্ধতা ছিল, তাহা কেন দূরে গেল,—তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সূর্য্যের আলোই অন্ধকারকে তাড়াইয়াছে এবং তাহাই সকলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

কেবল আলো দেওয়াই কি সূর্য্যের কাজ? তা নয়। সূর্য্য হইতে আমরা তাপও পাই। পৌষ মাসের শীতের দিনে রৌদ্রে দাঁড়াইলে শরীর কেমন গরম হয়, তোমরা দেখ নাই কি? তার পরে চৈত্র-বৈশাখ মাসের রৌদ্রের কথা মনে করিয়া দেখ। তখন রৌদ্রে বাহির হওয়াই দায়! মাটি বালি তাতিয়া আগুনের মত হয়; পুকুরের জল রৌদ্রের তাপে শুকাইয়া যায়। সূর্য্যের তাপ কি ভয়ানক!

চোখে সূর্য্য ও চাঁদকে আকারে প্রায় একই রকমের দেখায়। কিন্তু চাঁদের আলো খুব কম এবং তাহার তাপ একবারে বুঝাই যায় না। সূর্য্য কি-রকম জিনিস এবং তাহার এত তাপ ও আলো কোথা হইতে আসে, এ-সব কথা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা করে না কি? আজ তোমাদের সেই-সব কথাই একে-একে বলিব।

প্রথমে সূর্য্যের আকারের কথাটাই বলা যাক্। আকারে সূর্য্য ভয়ানক বড়,—এত বড় যে পৃথিবীর উপরকার বড় বড় পাহাড়পর্ব্বতকে তার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না। এমন কি, আমরা যে পৃথিবীর উপরে বাস করি, তাহার চেয়েও সূর্য্য অনেক বড়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ,—এ-কথা ঠিক্ নয়। যে-সূর্য্যকে প্রতিদিন প্রাতে একখানি থালার আকারে আকাশের গায়ে দেখা যায়, তাহা আবার কেমন করিয়া আমাদের পৃথিবীর চেয়ে বড় হইবে? কিন্তু সত্যই সূর্য্য প্রকাণ্ড জিনিস। খুব দূরে আছে বলিয়াই, ইহাকে আমরা ছোট দেখি।

দূরের জিনিস যে ছোট দেখায় ইহা তোমরা জানো না কি? হাড়গিলে, শকুন, চিল খুব বড় পাখী। যখন গাছের ডালে বসিয়া থাকে, তখন ইহাদের কাছে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু ইহারাই যখন আকাশের খুব উঁচু জায়গায় উড়িয়া বেড়ায়, তখন সেগুলিকে কত ছোট বলিয়া বোধ হয়, তোমরা দেখ নাই কি? বড় বড় গিন্নী শকুনকে তখন চড়াই বা শালিক পাখীর মত ছোট দেখায়। তার পরে তোমরা যখন ঢাউস্ ঘুঁড়ি উড়াইতে থাক, তখন খুব উপরে উঠাইলে সেটিকে ছোট দেখায় না কি? অত বড় ঘুঁড়ি-খানাকে বোধ হয় যেন একটা কাগজের টুক্‌রো। দূরে থাকিলে সকল বড় জিনিসকেই এই-রকম ছোট দেখায়।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিয়াছ, থালার মত ছোট

দেখায় বলিয়া সূর্য্য ছোট জিনিস নয়। সূর্য্য অতি-প্রকাণ্ড জিনিস!

পৃথিবী কত বড়, তাহা বোধ হয় তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। ইহার বেড় প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। মনে কর, কলিকাতায় জাহাজে চড়িয়া আমরা পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইলাম। প্রথমে ভারত-সাগর দিয়া জাহাজ চলিল। তার পরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া ইংলণ্ডের কাছে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে পড়া গেল। শেষে আমেরিকার কাছ দিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর, জাপান ও চীন দেশ ছাড়িয়া আবার কলিকাতায় পৌঁছানো হইল। এই রাস্তাটা প্রায় পঁচিশ হাজার মাইল। সুতরাং বলিতে হয়, পৃথিবীর বেড় পঁচিশ হাজার মাইল।

আজকাল অনেকে জাহাজে চড়িয়া এতটা পথ যাইতেছে এবং পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতেছে। জাহাজ বন্দরে বন্দরে থামে, এবং কয়লা ও জল বোঝাই লয়। তাই ঐ-রকমে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে দুই তিন মাস সময় লাগে। পৃথিবী ফুট্‌বলের মত গোল জিনিস। ফুট্‌বলের চামড়ায় যে সেলাইয়ের দাগ থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? মনে কর, সেই সেলাইয়ের দাগের মত এক রেল-রাস্তা যেন পৃথিবীর উপর দিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে এবং আমরা যেন সেই রেল-লাইনের একখানি ডাক্‌গাড়ীতে চাপিয়া পৃথিবী ঘুরিতে বাহির হইয়াছি। গাড়ী কোনো জায়গায় থামিল না,—দিন-রাত হুস্-হাস্ করিয়া

ছুটিতে লাগিল। এ-রকমে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে আমাদের একুশ-বাইশ দিনের বেশি সময় লাগিবে না।

তিন চারি ইঞ্চি লম্বা লোহার শলা বা বড় ছুঁচ দিয়া একটা লেবুকে ফোঁড়া যায়। পৃথিবী লেবুরই মত গোল। মনে কর, আকাশ-জোড়া এক প্রকাণ্ড রাক্ষসকে ডাকিয়া আমরা বলিলাম,—তুমি মাঝামাঝি একটা শলা চালাইয়া আমাদের পৃথিবীকে ফুঁড়িয়া দাও। রাক্ষস খুব লম্বা শলা আনিল এবং তাহার মাথার উপরকার ঝড়ের মেঘের মত চুলগুলোকে দোলাইয়া পৃথিবীর এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্য্যন্ত একটা প্রকাণ্ড শলা চালাইয়া দিল। এই শলাটিকে তোমরা যদি মাপ কর, তাহা হইলে ইহাকে প্রায় আট হাজার মাইল লম্বা দেখিবে। কাজেই বলিতে হয়, যদি আমরা কূয়োর মত খুঁড়িয়া পৃথিবীর এপিঠ হইতে ওপিঠে যাইতে চাই, তবে সুড়ঙ্গটিকে আট হাজার মাইল গভীর করিতে হইবে।

তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় বুঝিয়াছ, আমাদের পৃথিবীখানি নিতান্ত ছোট নয়। কিন্তু সূর্য্য পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। এত বড় যে আন্দাজ করাও শক্ত। কতকগুলি উদাহরণ দিই, তাহাতে আন্দাজ করিতে পারিবে।

পৃথিবীর বেড় পঁচিশ হাজার মাইল। রেল-গাড়ীতে চড়িয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে একুশ-বাইশ দিন সময় লাগে। ইহা তোমরা শুনিয়াছ। মনে কর, সূর্য্যকে ঘিরিয়া রেল-রাস্তা আছে। আমরা যেন তাহারি একখানা গাড়ীতে

চাপিয়াছি। গাড়ী হু-হু শব্দে দিবারাত্রি চলিতে আরম্ভ করিল। তোমরা কত দিনে এই-রকমে সূর্য্যকে বেড় দিতে পারিবে জানো কি? গাড়ী সাত বৎসর দিনরাত্রি না চলিলে র্য্যকে ঘুরিয়া আসিতে পারিবে না। অর্থাৎ আমাদের সাত বৎসরের খাবারের মত চাল দাল তেল নুন এবং গাদা গাদা কাপড়-জামা সঙ্গে লইয়া তবে সূর্য্যকে ঘুরিতে বাহির হইতে হইবে। পৃথিবীকে ঘুরিতে একুশ দিন লাগে এবং সূর্য্যকে ঘুরিতে সাত বৎসর লাগে। এখন ভাবিয়া দেখ, পৃথিবীর চেয়ে সূর্য্য কত বড়।

আর একটা উদাহরণ দিই। মনে কর, একদিন বিশ্বকর্ম্মাকে বিধাতা হুকুম দিলেন,—"আমাদের সূর্য্যের মত আর একটা নূতন সূর্য্য তৈয়ার কর।"

বিধাতার হুকুম অমান্য করার উপায় নাই। পৃথিবীর মত যে-সব বড় বড় জিনিস আকাশে আছে, সেগুলিকে টানিয় আনিয়া বিশ্বকর্ম্মা কাদা করিতে লাগিলেন এবং তাহা দিয়া নূতন সূর্য্য গড়া হইতে লাগিল। পৃথিবীর মত কতগুলা গ্রহ দিয়া নূতন সূর্য্য গড়া যাইবে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। আমরা ইহার একটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি। পৃথিবীর মত সাড়ে-তের লক্ষ বড় জিনিস কাদা না করিলে বিশ্বকর্ম্মা কখনই একটা নূতন সূর্য্য গড়িতে পারিবেন না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, একা সূর্য্য সাড়ে-তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। অর্থাৎ সূর্য্যকে যদি একটা

কাঁটালের মত মনে করা যায়, তবে তাহার তুলনায় পৃথিবী হইয়া দাঁড়ায় একটা সরিষার সমান।

সূর্য্য পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, এখন তোমাদিগকে সেই কথা বলিব। এত প্রকাণ্ড জিনিসকে আমরা যখন একখানি ছোট রেকাবের মত দেখি, তখন বুঝা যায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে নিতান্ত কম দূরে নাই। অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেক পরিশ্রমে এই দূরত্বের একটা হিসাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে। পৃথিবীতে আমরা দু-মাইল দশ-মাইল বা দু-হাজার দশ-হাজার মাইল লইয়া হিসাবপত্র করি। তাই সূর্য্যের ঐ দূরত্বটা যে কত, তাহা আমরা মনেই করিতে পারি না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। আগেকার মত মনে কর, আমাদের পৃথিবী হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত যেন একটা রেলের রাস্তা আছে এবং আমরা সেই রেল-লাইনের একখানা গাড়ীতে চাপিয়া সূর্য্যলোকে যাইবার জন্য যেন বাহির হইয়া পড়িলাম। গাড়ী ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। এই-রকমে কত দিনে আমরা সূর্য্যে পৌঁছিতে পারিব, তোমরা আন্দাজ করিতে পার কি? হিসাব করিলে দেখিবে, গাড়ীখানি তিন শত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া দিনরাত না চলিলে কখনই সূর্য্যে পৌঁছিতে পারিবে না। কি ভয়ানক দূরত্ব!

সূর্য্যের তাপ ও আলো

সূর্য্য কত বড় এবং পৃথিবী হইতে কত দূরে আছে, এ-সব কথা তোমরা আগে শুনিয়াছ। কিন্তু দূরে থাকিয়াও তাহার কি ভয়ানক তাপ ও আলো!

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের তাপের ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় এবং আলোতে চোখ জ্বালা করে, অথচ সূর্য্যের সমস্ত তাপ ও আলোর অতি সামান্য অংশই পৃথিবীর উপরে পড়ে। মনে কর, তোমাদের ঘরের টেবিলের উপরে একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছে এবং অনেক দূরে ঘরের কোণে একটা ছোট মার্বেল পড়িয়া আছে। ঘরের টেবিল চেয়ার ছবি প্রভৃতি সব জিনিসেই ল্যাম্পের আলো পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্বেলের উপরেও একটু আলো আসিল। ল্যাম্পের সমস্ত আলোর তুলনায় মার্বেলের উপরকার আলোটুকু কত অল্প তাহা মনে করিয়া দেখ। সূর্য্যের সমস্ত তাপ ও আলোর তুলনায় পৃথিবী যে তাপ-আলো পায়, তাহা ইহা অপেক্ষাও অনেক অল্প। আবার আমাদের আকাশের বাতাস ও জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়া আসিবার সময়ে ইহার অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্যের তাপ ও আলোকের কোটি-কোটি ভাগের এক ভাগের প্রতাপ যদি এত হয়, তবে সূর্য্যে কত তাপ ও কত আলো আছে একবার ভাবিয়া দেখ। সার জন্ হার্সেল নামে একজন বড়

জ্যোতিষী কিছুদিন আফ্রিকায় বাস করিয়াছিলেন। সেখানে ডিম ও মাংস ভাজিবার জন্য তাঁহাকে প্রায়ই উনন জ্বালিতে হইত না। কাচের বাক্সে ভরিয়া তিনি সেগুলিকে কয়েক ঘণ্টা মাত্র রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিতেন। সূর্য্যের তাপেই ডিম ও মাংস সিদ্ধ হইয়া যাইত। ছোট আতসী কাচের উপরে কতটুকুই-বা সূর্য্যের তাপ পড়ে। কিন্তু সেই তাপটুকুই যখন কাচের ভিতর দিয়া একত্র হয়, তখন তাহা দিয়া কাগজ, শুক্‌নো পাতা, এমন কি কাঠ পর্য্যন্ত জ্বালানো যায়। তোমরা ইহা দেখ নাই কি? ছেলেবেলায় আমার একখানা আতসী কাচ ছিল। তাই দিয়া শুক্‌নো-পাতায় প্রায়ই আগুন ধরাইতাম। ঘরে দুয়ারে আগুন লাগিবার ভয়ে গুরুজনেরা খুব তাড়া দিতেন। আজও সে-সব কথা মনে আছে।

যাহা হউক সূর্য্য কত তাপ দেয় তার একটা হিসাবের কথা বলি। দুই হাত লম্বা এবং দুই হাত চওড়া জায়গাটি যে কত ছোট তাহা তোমরা মাপিয়া দেখিয়ো,—এতটুকু জায়গায় হয় ত দু'জন লোকও ভালো করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সূর্য্যের উপরকার এই-রকম একটু ছোট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে তাপ বাহির হয়, পৃথিবীতে দুই শত মণ কয়লা পুড়াইলেও তাহা পাওয়া যায় না। এখন ভাবিয়া দেখ, সূর্য্যকে এক ঘণ্টার জন্য জ্বালাইয়া রাখিতে গেলে কত কোটি-কোটি মণ কয়লারই দরকার হয়। একজন বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি সমস্ত সূর্য্যটা কেবল কয়লা

দিয়াই প্রস্তুত হইত, তবে সেই কয়লার আগুনে আমরা এক হাজার বৎসর মাত্র তাপ পাইতাম। তার পর সমস্ত কয়লা পুড়িয়া যাইত এবং সূর্য্য নিভিয়া এক প্রকাণ্ড ছাইয়ের গাদা হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু সূর্য্য লক্ষ-লক্ষ বৎসর ধরিয়া তাপ ছড়াইয়া আজো নিভে নাই। আশ্চর্য্য নয় কি?

তোমরা কি মনে কর জানি না, কিন্তু আমি যখনি সূর্য্যকে দেখি, তখনি মনে করি সেখানে ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। সত্যই তাই, সূর্য্যের আগাগোড়া প্রায় সকলি আগুন। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সূর্য্যের দেহ জ্বলন্ত বাষ্প দিয়া গড়া। সেখানে তোমার আমার মত প্রাণী গেলে এক সেকেণ্ডে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, সূর্য্য বাতাসের মত হাল্‌কা বাষ্প দিয়া গড়া। মনে কর, তোমরা যেন একটা ফুট্‌বলের ব্লাডারের ভিতরে অনেক বাষ্প পম্প করিয়া রাখিলে। এই-রকমে চাপ পাইলে বাতাস যেমন গাঢ় হয়, বা আরো বেশি চাপে অন্য বাষ্প যেমন জমাট বাঁধিয়া যায়, সূর্য্যের বাষ্পের অবস্থা সেই-রকমের। এই-রকম গাঢ় বা কতকটা জমাট জ্বলন্ত বাষ্প একত্র হইয়া সূর্য্যকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের স্তূপ করিয়া তুলিয়াছে। সূর্য্যে জল, মাটি, পাহাড়, পর্ব্বত, লোহা, তামা,—কোনো জিনিসকেই ঠিক অবস্থায় দেখা যায় না। সবই জ্বলিয়া পুড়িয়া বাষ্প হইয়া আছে।

আমাদের পৃথিবী কেবল ধূলা মাটি পাথর জল দিয়াই

গড়া নয়। পৃথিবীর উপরে পঁচিশ ক্রোশ পর্য্যন্ত বাতাস আছে এবং তাহাতে কত জলীয় বাষ্প ও কত মেঘ ভাসিয়া বেড়ায়। পৃথিবী এই বাতাস মেঘ ও বাষ্পাকে কাছ-ছাড়া হইতে দেয় না। তোমরা যেমন শীতকালের দিন লেপ গায়ে জড়াইয়া রাখ, পৃথিবীও সেই-রকমে বাতাস দিয়া গা ঢাকিয়া রাখে। ইহাকে সে কখনই কাছ-ছাড়া হইতে দেয় না—জোরে টানিয়া গায়ে আট্‌কাইয়া রাখে। সুতরাং আমাদের বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর জিনিস। যাহা হউক পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মত সূর্য্যেরও এক বাষ্পমণ্ডল আছে। কিন্তু তাহা অতি ভয়ানক জিনিস। আমাদের বায়ুমণ্ডল কুড়ি-পঁচিশ মাইল গভীর,—সূর্য্যের বাষ্প-মণ্ডল লক্ষ লক্ষ মাইল গভীর হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। সূর্য্যের সব আলো ও তাপ ঐ বাষ্প-মণ্ডল হইতেই বাহির হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কত ঝড়, কত বৃষ্টি হয়, তোমরা নিশ্চয়ই তাহা দেখিয়াছ। বড় বড় নৌকা ও ষ্টীমার এই সব ঝড়ে ডুবিয়া যায়, কত ঘরবাড়ী গাছপালা পড়িয়া যায়। সূর্য্যের বাষ্পমণ্ডলেও এই-রকম ঝড় হয়,—কিন্তু সে ঝড় কি প্রকাণ্ড! প্রতি সেকেণ্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে সেই জ্বলন্ত বাষ্প জোরে সূর্য্যের আকাশের উপরে উঠে, তার পরে সেখানে ঠাণ্ডা হইয়া তাহাই আবার হুড়্‌মুড়্‌ করিয়া নীচে নামে। আমাদের পৃথিবীতে হয় ত বৎসরে দুই তিনবার ঝড় হয়। কিন্তু সূর্য্যের আকাশে ঝড় লাগিয়াই

আছে। লক্ষ-লক্ষ মাইল জুড়িয়া এই ঝড় কুড়ি পঁচিশ দিন এমন কি এক মাস পর্য্যন্ত চলে। তখন ঝড়ের চোটে সূর্য্যের উপরকার জ্বলন্ত বাষ্প সরিয়া যায় এবং সেই-সব জায়গায় এক-একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গর্ত্তগুলি বুঝি দশ হাত বা বিশ হাত চওড়া। কিন্তু তাহা নয়। সূর্য্যের উপরকার ঝড়ের গর্ত্তে আমাদের পৃথিবীর মত বড় জিনিস হাজার দু-হাজার অনায়াসে লুকাইয়া

সূর্য্যের একটা খুব বড় কলঙ্ক।

থাকিতে পারে। তোমরা চাঁদের গায়ে যে-রকম কালো-কালো কলঙ্ক দেখিতে পাও, ঘূর্ণি-ঝড়ের সময়ে সূর্য্যের গায়েও

এ-রকম কালো দাগ দেখা যায়। দূরবীণ দিয়া সূর্য্যকে দেখিলে প্রায় সকল সময়েই তোমরা ঐ-রকম দাগ দেখিতে পাইবে। প্রায় পনেরো-ষোল বৎসর আগে আমরা সূর্য্যের গায়ে খালি-চোখেই একটা প্রকাণ্ড বড় কলঙ্ক দেখিয়াছিলাম। সেই গর্ত্তটা এত বড় ছিল যে, তাহার ভিতরে দুই হাজার পৃথিবী লুকাইয়া থাকিতে পারিত।

এখানে সূর্য্যের কতক অংশের ছবি দিলাম। ইহাতে অনেকগুলি কলঙ্কের দাগ দেখিতে পাইবে। দূরবীণে সূর্য্যের কলঙ্ক ঠিক্ এই-রকমই দেখা যায়। ঝড়ের সময়ে সূর্য্যের জ্বলন্ত বাষ্পমণ্ডল হইতে যে আগুনের শিখা উঠে, তাহারো ছবি দেওয়া গেল। এ-গুলি সূর্য্যকে ছাড়িয়া ভয়ানক বেগে লক্ষ-

সূর্য্যের কলঙ্ক।

লক্ষ মাইল উপরে উঠে এবং একটু পরে ভয়ানক বেগে নীচে নামিয়া আসে। কিন্তু সূর্য্যের এই আগুনের শিখা দেখা বড় মুস্কিল। সূর্য্যের আলোতে এগুলি ঢাকা থাকে, তাই দেখা যায় না! পূর্ণ-গ্রহণের সময়ে যখন সূর্য্যের আসল দেহটা ঢাকা পড়িয়া যায়, কেবল তখনি তাহার বাষ্পমণ্ডলের

সব ব্যাপার নজরে পড়ে। জ্যোতিষীরা সেই-সময়ে সূর্য্যের ফোটোগ্রাফ্ লইয়া থাকেন। সূর্য্যের শিখার যে ছবি
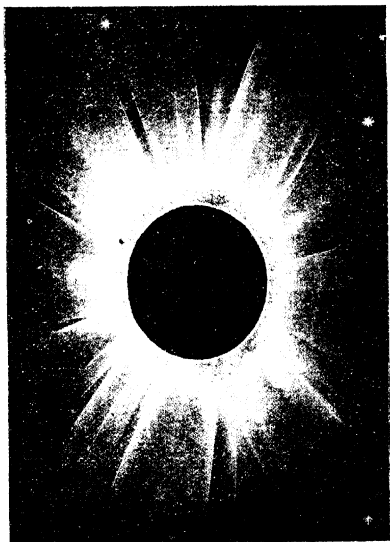
পূর্ণ গ্রহণের সময় সূর্য্যের শিখা।

দিলাম তাহা ঐ-রকম একটা ফোটোগ্রাফ্ দেখিয়াই আঁকা হইয়াছে।

লক্ষ-লক্ষ বৎসর ধরিয়া সূর্য্যে যে ভয়ানক আগুন জ্বলিতেছে, তাহা কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তোমরা ভাবিয়া

দেখিয়াছ কি ? প্রদীপের তেল ফুরাইলে প্রদীপ নিবিয়া যায়, তখন ঘর অন্ধকার হইয়া পড়ে। উননের কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে, তাহাতে আর একটুও আগুন থাকে না। সূর্য্যে যখন এতদিন ধরিয়া আগুন জ্বলিতেছে, তখন বুঝিতেই হইবে নিশ্চয়ই তাহাতে কোনো রকম কয়লা তেল বা আর কিছু আসিয়া পড়িতেছে। পণ্ডিতেরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন, কিন্তু কাহাকেও সূর্য্যে তেল বা কয়লা ঢালিতে দেখেন নাই।

এত তাপ খরচ করিয়াও সূর্য্য যে-রকমে নিজের শরীরটাকে গরম রাখে তাহা বড়ই মজার। বাতাসের মত কোনো বাষ্পীয় জিনিসকে তোমরা ছোট জায়গায় পূরিয়া চাপ দিয়া দেখিয়াছ কি ? বোধ হয় দেখ নাই। ফুট্‌বলের ব্লাডারের মধ্যে যখন খুব তাড়াতাড়ি অনেক বাতাস পোরা যায়, তখন ব্লাডারের উপর হাত দিয়া দেখিয়ো,—দেখিবে, ব্লাডার গরম হইয়া উঠিয়াছে। বাইসিকেল গাড়ীর চাকার গায়ে যে রবারের থলির মত গদি লাগানো থাকে তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। ইহার ভিতরে যখন জোরে বাতাস পম্প্‌ করা যায়, তখন থলির ভিতরের বাতাস গরম হইয়া উঠে। যে-বাতাস বাহিরে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছিল, একটুখানি জায়গার মধ্যে চাপাচাপি রাখা হইল বলিয়াই তাহা গরম হয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বাতাসকে সঙ্কুচিত করিলেই তাহা গরম হইয়া পড়ে। কেবল বাতাস নয়,—

বাষ্পমাত্রকেই এই-রকমে গরম করা যায়। ইহার জন্য কাঠ কয়লা বা তেল পোড়াইবার দরকারই হয় না। পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্যের দেহে যে বাষ্প আছে, তাহা তাপ ছাড়িয়া সঙ্কুচিত হইতেছে। কাজেই ইহাতে সূর্য্যে আপনা হইতেই নূতন তাপের সৃষ্টি হইতেছে। এইজন্যই সূর্য্য প্রতিদিন এত তাপ ছাড়িয়াও ঠাণ্ডা হইতেছে না।

তোমরা হয় ত এখন ভাবিতেছ,—প্রতিদিনই যখন সূর্য্যের দেহ সঙ্কুচিত হইতেছে, তখন দিনে-দিনে তাহাকে আকারে ছোট দেখা যায় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আছে। জ্যোতিষীরা বলেন, সূর্য্য এত অল্প-অল্প করিয়া ছোট হইতেছে যে, দু'হাজার চারি হাজার বৎসর পরীক্ষা করিলেও এই ছোট হওয়া কাহারো নজরে পড়িবে না; লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যে-সব লোক পৃথিবীতে জন্মিবে তাহারাই হয় ত সূর্য্যকে এখনকার চেয়ে ছোট দেখিবে।

সূর্য্য ছোট হইলে ভয় নাই, কিন্তু ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া ইহা যখন নিবিয়া যাইবে, সেই অবস্থাটার কথা মনে করিলে ভয় হয়। জ্যোতিষীরা বলেন, সত্যই সূর্য্যের সেই অবস্থা একদিন আসিবে। তখন তাহার এত তাপ, এত আলো দেখা যাইবে না। পৃথিবীর মাটি পাথর যেমন আলোহীন ও তাপহীন, তখন সূর্য্যের দেহ ঠিক্ সেই-রকমই হইয়া দাঁড়াইবে। ভাবিয়া দেখ সেই-সময়ে এই জগতের দশা কি হইবে,—তাপ না পাইয়া বৃষ্টি হইবে না, গাছপালা সকলি

মরিয়া যাইবে,—এমন কি জল ও বাতাসও ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধিয়া যাইবে, মানুষ গোরু ঘোড়া ছাগল প্রভৃতির চিহ্নও এই পৃথিবীতে থাকিবে না। এই পৃথিবীখানা তখন একটা মহাশ্মশানের মত ধূ-ধূ করিতে থাকিবে। ইহাই মহাপ্রলয়! তোমরা বোধ হয় ভয় পাইতেছ, কিন্তু ভয়ের একটুও কারণ নাই, এই সর্ব্বনাশ দেখিবার জন্য তুমি বা আমি কেহই তখন বাঁচিয়া থাকিব না। কত লক্ষ-লক্ষ বৎসর পরে যে এই মহাপ্রলয় হইবে, তাহার আজও হিসাবই হয় নাই।

সূর্য্য কত তাপ দেয় তাহা তোমরা শুনিয়াছ। এখন ইহা হইতে কত আলো পাওয়া যায় তাহার কথা বলিয়াই আমরা সূর্য্যের কথা শেষ করিব। ম্যাজিক লণ্ঠন বা বায়স্কোপে যে আলো জ্বালা হয়, তাহা তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। সব আলোর চেয়ে ইহারি জোর বেশি। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই আলো বুঝি সূর্য্যের আলোর সমান। কিন্তু তা' নয়। সার জন হার্সেল নামে একজন বড় জ্যোতিষী হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, বায়স্কোপের আলো সূর্য্যের আলোর দেড় শত ভাগের এক ভাগের সমান। আর একটা হিসাবের কথা বলিব। পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদ হইতে কত আলো পাওয়া যায়, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তখন জ্যোৎস্নার আলোতেই বই পড়া যায়। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ছয় লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ এক সঙ্গে আলো না

দিলে, সূর্য্যের আলোর মত আলো পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সমস্ত আকাশটাকে যদি চাঁদে চাঁদে ছাইয়া ফেলা যায়, তবেই সূর্য্যের মত আলো হয়। সূর্য্য হইতে আমরা কত আলো পাই, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ।

আলোর উৎপত্তি

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘর-দুয়ার সবই অন্ধকার; কিছুই দেখা যায় না। এমন সময়ে ঘরে আলো জ্বালা হইল, আর সব জিনিসই তোমাদের নজরে পড়িল। রাত্রিতে কি ভয়ানক অন্ধকারই হয়। আকাশের এক কোণে কত কোটি কোটি মাইল দূরে যেই সূর্য্য দেখা দিল, অমনি অন্ধকার কাটিয়া গেল। তোমরা তখন ঘরের এবং বাইরের সব জিনিস সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিলে।

ইহা কেন হয়? আলো জিনিসটাই বা কি,—তোমরা সকলে বোধ হয় তাহা জানো না। আমরা সেই-সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

প্রদীপ জ্বালিলে তাহার আগুন হইতেই যে, আলো আসিয়া তোমার চোখে মুখে এবং বইয়ের পাতায় পড়ে, তাহা বেশ বুঝা যায়। তোমার বইখানিকে আড়াল দিয়া প্রদীপ ঢাকিয়া রাখ,—দেখিবে বইখানায় আলো আট্‌কাইয়া যাইতেছে,—বইয়ের পিছনটা তখন অন্ধকার। তেমনি ছাতা দিয়া সূর্য্যের আলো আট্‌কাইয়া ফেল,—দেখিবে ছাতার নীচে রৌদ্র আসিতেছে না।

কোনো জিনিসকে এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় আনিতে হইলে, তাহাকে বহিয়া আনিতে হয়। নদীর

স্রোতের জলে যখন পাতা বা ফুল ভাসিয়া চলে, তখন বুঝা যায়, নদীর জলই সেগুলিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। ঝড়ের সময়ে যখন পথের ধূলা-বালি উড়িয়া তোমার ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়ে, তখন বুঝা যায় বাতাসই ধূলাকে উড়াইয়া ঘরে আনিতেছে। কামানের গোলা যখন ভয়ানক বেগে ছুটিয়া দশ-পনেরো ক্রোশ দূরের ঘর-বাড়ী ভাঙিতে আরম্ভ করে, তখনো বুঝা যায় কামানের ভিতরে ভয়ানক ধাক্কা পাইয়া গোলা ছুটিয়া চলিয়াছে। যখন আলো প্রদীপের আগুন হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘর-দুয়ার ছাইয়া ফেলে তখন কি তাহা এই-রকমেই চলে? তোমরা কি মনে করিতেছ জানি না, কিন্তু আলো কখনই বাতাসে ভর করিয়া বা কোনো জিনিসের ধাক্কা পাইয়া চলে না।

বৈজ্ঞানিকেরা এ-সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা বলেন, সব জিনিসই যে ধূলার মত উড়িয়া বেড়ায় বা কামানের গোলার মত চলা-ফেরা করে, তাহা নয়। এগুলি ছাড়া অন্য-রকমেও দূরের একটা-কিছু কাছে আসিতে পারে। উদাহরণ দিলে তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তোমাদের বাড়ীর ছাদ তৈয়ারীর জন্য একটা লম্বা লোহা বা কাঠের কড়ি আঙিনায় পড়িয়া আছে এবং একজন মিস্ত্রী যেন বড় হাতুড়িটা দিয়া তাহার এক প্রান্তে ঢঙ-ঢঙ করিয়া ঘা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তুমি যেন কড়ির অন্য প্রান্তে হাত লাগাইয়া বসিয়া আছ। হাতুড়ির আঘাতে

কড়ি কাঁপিয়া উঠিল এবং তার পর সেই কাঁপুনি কড়ির ভিতর দিয়া চলিয়া তোমার হাতে পৌঁছিল—তোমার হাতখানা ঝিন্-ঝিন্ করিয়া উঠিল। এই-রকমে কাঁপুনির চলা-ফেরা তোমরা কি কখনই দেখ নাই? ঝড়ের সময়ে বাতাসের ধাক্কায় যেমন ধূলা-বালি উড়িয়া ঘরে আসিয়া পড়ে, ঐ কাঁপুনি কি সেই-রকমেই আসিল? কখনই না। আবার মনে কর, তোমাদের পুকুরের ধারে দাঁড়াইয়া তুমি যেন জলে একটা ঢিল ছুড়িয়া ফেলিলে। জল স্থির ছিল। যেখানে ঢিল ফেলিলে এখন সেখানে ঢেউ উঠিল। প্রথম ঢেউগুলি গাড়ীর চাকার মত ছোট হইয়া দেখা দিল। তার পরে তাহাই পরে পরে বড় হইয়া সমস্ত পুকুরের জলকে ছাইয়া ফেলিল এবং শেষে তোমাদের বাঁধা ঘাটে আসিয়া ধাক্কা দিল। এখানে ঢিলের ধাক্কা পাইয়া জলই কি দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া ঘাটের সিঁড়িতে ঠেকিল? কখনই না। স্থির জলে ঢিল ফেলিলে যে ঢেউ হয়, তাহা জলকে টানিয়া দূরে আনে না। যেখানকার জল সেখানেই থাকিয়া কেবল উঁচু-নীচু হইয়া নাচিতে থাকে, তাহাতেই ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। ঢেউয়ের উপরে যে ফুল বা পাতা ভাসিতে থাকে, তাহা কখনই ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া দূরে যায় না,—সেগুলি জলের উঠা-নামার সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়াইয়া তালে তালে নাচিতে থাকে মাত্র। মনে কর, তোমরা রেলগাড়িতে উঠিবার জন্য টিকিট কিনিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছ,—

একখানা মালগাড়ী হুস্-হুস্ করিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মালগাড়ির চাকার দাপটে তখন তোমাদের পায়ের তলার মাটি কি-রকমে কাঁপিয়া উঠে দেখ নাই কি? তখন বোধ হয় যেন ভূমিকম্প হইতেছে। মালগাড়ীর চাকার তলার মাটি ছুটিয়া আসিয়া তোমার পায়ের তলায় ধাক্কা দেয় কি? কখনই না। চাকার জোরে তাহার নীচেকার মাটিই কেবল ধাক্কা পায়। তার পরে সেই মাটি তার পাশের মাটিকে ধাক্কা দিয়া নিজে স্থির হয়। এই-রকমে জলের ঢেউয়ের মত সেই ধাক্কার ঢেউ মাটির তলা দিয়া চলে। তাহাই যখন তোমার পায়ের তলার মাটিতে আসিয়া পৌঁছে, তখনি তোমার পা কাঁপিয়া উঠে।

যে-সব কথা বলিলাম, তাহা যদি ঠিক বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তোমরাও নিশ্চয় বলিবে, ঝড়ের ধূলা বা বন্দুকের গুলি যেমন এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় ছুটিয়া চলে, জলের ঢেউ বা লোহা, মাটি কাঠ-পাথর প্রভৃতির কাঁপুনি সে-রকমে চলে না। সূর্য্য বা প্রদীপ হইতে আলো আসিয়া যখন তোমার চোখে মুখে পড়ে, তখন তাহা ঐ-রকম কাঁপুনির আকারেই আসে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ,—এ আবার কি-রকম ঢেউ? জলে বা বাতাসে যেমন ঢেউ উঠিতে পারে, মাটি পাথর কাঠ যখন ধাক্কা পাইয়া কাঁপে তখন তাহারো ভিতর দিয়া তেমনি ঢেউ চলিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে জল নাই,

বাতাসও সব জায়গায় নাই,—তবে কাহাকে কাঁপাইয়া আলোর ঢেউ সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে ?

ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা একটা বড় আশ্চর্য্য কথা কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, এই চন্দ্র-সূর্য্য পৃথিবী নক্ষত্র লইয়া যে অনন্ত আকাশ আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, তাহা শূন্য নয়; "ঈথর" নামে একরকম অতি-সূক্ষ্ম পদার্থ ঐ অনন্ত জায়গাটি জুড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা হয় ত ইহাকে বাতাস বা বাতাসের মত কোনো একটা জিনিস মনে করিতেছ। কিন্তু তাহা নয়। বাতাস পৃথিবীর উপরে কয়েক ক্রোশ মাত্র আছে। যেখানে চাঁদ, সূর্য্য এবং গ্রহ-নক্ষত্রেরা আছে, সেখানে বাতাস নাই,—কেবল ঈথরই আছে। বাতাসকে যেমন চোখে দেখা যায় না, ঈথরকেও কেহ দেখিতে পায় না এবং তাহা বাতাসের মত জোরে ছুটিয়া আসিয়া কখনই গায়ে ধাক্কা দেয় না। বাতাস সব জিনিসের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু ঈথর জিনিসটা ইট্, কাঠ, মাটি, পাথর এমন কি লোহা, তামা ইত্যাদি কঠিন দ্রব্যের ভিতরে থাকিতে পারে। জিনিস যতই শক্ত হউক, তাহার অণুগুলির মধ্যে বেশ একটু ফাঁক থাকে। এই-সব ফাঁক দিয়া বাতাস যাওয়া-আসা করিতে পারে না, কিন্তু ঈথর সেই-সব ফাঁক সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া বসিয়া থাকে। ঈথর কি-রকম জিনিস এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যাহাকে চোখে দেখা যায় না

ছুঁইয়া বুঝা যায় না, এমন একটা অদ্ভুত জিনিসকে মানিয়া লওয়া শক্ত। নিশ্চয়ই শক্ত—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতেরা এ-সম্বন্ধে যে-সব প্রমাণ দেখাইয়াছেন তোমরা যখন সেগুলি বুঝিবে, তখন আকাশ পাতাল সব জায়গাতেই যে ঈথর আছে, ইহা তোমরাও স্বীকার করিবে।

যাহা হউক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন,—যে ঈথর নামে জিনিসটি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছে, আলো তাহারি ঢেউ। সূর্য্যে কি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, তাহা তোমরা জানো। কত-রকম বাষ্প দিবারাত্রি জ্বলিয়া-পুড়িয়া এবং পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া কি কাণ্ড করিতেছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। প্রদীপের শিখা দেখিতে ছোট কিন্তু সেখানেও কম ব্যাপার হয় না। তাপ পাইলেই প্রদীপের তেল বাষ্প হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে তাহারি কতক অংশ ভাঙিয়া-চুরিয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া নূতন তাপের স্থষ্টি করে। তখন শিখার ভিতরকার সকলেরি অণু-পরমাণু থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করে। আগুনের একটুখানি শিখার ভিতরে এত কাণ্ডই চলে!

কেবল সূর্য্য এবং প্রদীপের শিখাতেই যে এই-রকমটি হয়, তাহা নয়। যেখানে আগুন এবং যেখানে তাপ,—সেখানে অণু-পরমাণুর এই-রকম ভাঙা-গড়া ধাক্কাধুক্কি এবং এবং কাঁপুনি চলে। তোমরা যখন পুকুরের স্থির জলে ঢিল ফেলিয়া জল কাঁপাও তখন সেই কাঁপুনিতে জলে ঢেউ হয়

এবং তাহা জলের উপর দিয়া দূরে ছড়াইয়া পড়ে। হাতুড়ির ঘা মারিয়া মিস্ত্রীরা যখন লোহার কড়িকে কাঁপায়, তখন লোহার ভিতর দিয়া সেই কাঁপুনি ঢেউয়ের মত চলে। তাই তোমরা লোহার এক প্রান্তে হাত রাখিয়া সেই কাঁপুনি বুঝিতে পার। আগুনের বাষ্পের অণু-পরমাণু যখন কাঁপে, তখন তাহাতেও চারিপাশের ঈথর কাঁপিয়া উঠিয়া যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সত্যই এই-রকমে আগুনের কাছের ঈথরে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। তার পরে পুকুরের জলের ঢেউ যেমন জলের উপর দিয়া ছুটিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে—প্রদীপের কাছের ঈথরের ঢেউও ঠিক সেই-রকমে ছুটিতে আরম্ভ করে। তার পরে সেগুলি যখন আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখনি আমরা আলো দেখি।

জলের উপরকার ঢেউ কত শীঘ্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। ঈথরের ঢেউ কত শীঘ্র চলে, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার হিসাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রতি সেকেণ্ডে উহা এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল বেগে ছুটিয়া চলে। অর্থাৎ যদি এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বলে, তবে তাহার আলো তোমার চোখে পৌঁছিতে এক সেকেণ্ডের বেশি সময় লইবে না। রেলগাড়ী খুব জোরে চলিলে ঘণ্টায় পঞ্চাশ ষাট মাইলের বেশি যায় না। গাড়ীতে চড়িয়া আমরা ইহার

একটা আন্দাজ করিতে পারি। কিন্তু আলো যে বেগে চলে, তাহার আন্দাজই হয় না। সূর্য্য হইতে পৃথিবী কত দূরে আছে, তাহা তোমরা আগে শুনিয়াছ। রেলগাড়ী করিয়া তোমরা যদি আজ সূর্য্য দেখিতে যাত্রা কর, তাহা হইলে দিনরাত চলিয়াও গাড়ী সাড়ে তিন শত বৎসরের আগে কখনই সূর্য্যে পৌঁছিবে না। কিন্তু এত দূরের সূর্য্য হইতে আলো পৃথিবীতে পৌঁছিতে সাড়ে সাত মিনিটের বেশি সময় লয় না। ভাবিয়া দেখ, আলো কত শীঘ্র চলে। এক সেকেণ্ড কত অল্প সময়, তাহা তোমরা জানো,—সেই সময়ের মধ্যে তুমি হয় ত একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পার না। কিন্তু ঐ এক সেকেণ্ড সময়ে আলো তিন হাজার ছয় শত চল্লিশবার পৃথিবীকে ঘুরিয়া আসিতে পারে।

বৈজ্ঞানিকেরা বড় মজার লোক। তোমরা যাহা চোখে দেখিয়া বা কানে শুনিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া থাক,—তাঁহারা সেগুলির কারণ খোঁজ করিতে লাগিয়া যান। বৎসরের পর বৎসর কত পরীক্ষা এবং কত হিসাবপত্র চলে। তার পরে সে-সম্বন্ধে ঠিক্ খবর পাওয়া যায়। ঈথরের ঢেউ চোখে আসিয়া ধাক্কা দিলে আমরা আলো দেখিতে পাই, ইহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু সেই ঢেউগুলি কত লম্বা তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আলো পরীক্ষা করিয়া এবং অনেক অঙ্ক কষিয়া আলোর ঢেউ কত লম্বা তাহা স্থির করিয়াছেন।

ঈথর চোখে দেখা যায় না। সেগুলি যখন আমাদের চোখে আসিয়া ধাক্কা দেয়, তখন আমরা কেবল আলোই দেখি। সেই-সব ঢেউ কত লম্বা চোখে না দেখিয়া ঠিক্ করা অশ্চর্য্য নয় কি? কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা তাহাও ঠিক্ করিয়াছেন। সে-সব কথা এখন তোমাদিগকে বলিব না এবং বলিলেও বুঝিবে না। এখন কেবল ইহাই জানিয়া রাখ,—ঈথরের সে-সব ঢেউয়ের ধাক্কায় আমরা আলো দেখি তাহা পদ্মা বা গঙ্গার ঢেউয়ের মত বড় নয়। আকারে সেগুলি নিতান্ত ছোট। এক ইঞ্চি জায়গাটা কতটুকু তাহা তোমরা জানো। একটা পয়সাকে ঠিক্ মাঝামাঝি মাপিলে এক ইঞ্চি হয়। এই-রকম ছোট জায়গায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার ঈথরের ঢেউ সাজাইয়া রাখা যায়। ভাবিয়া দেখ সেগুলি কত ছোট। এত ছোট জিনিস কাগজে আঁকিয়া দেখানো যায় না বা চোখেও দেখা যায় না। কলের কামানের গোলা একটার-পর-একটা ছুটিয়া আসিয়া যুদ্ধের মাঠে পড়ে,—ঈথরের ঢেউগুলিও সেই-রকম ধারাবাহিক আসিয়া আমাদের চোখে ধাক্কা দেয়। এই-রকমে এক-সেকেণ্ডে কতগুলি ঢেউ আমাদের চোখে আসিয়া ঠেকে তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, সেকেণ্ডে ষাটলক্ষ আশী হাজার কোটি ঢেউ চোখে আসিয়া ধাক্কা না দিলে আমরা আলো দেখিতে পাই না।

শব্দের উৎপত্তি

স্কুলে ঢঙ্ ঢঙ্ করিয়া ছুটির ঘণ্টা বাজিল। মাষ্টার মহাশয় আস্তে আস্তে খাপে চশমা রাখিয়া চেয়ার হইতে উঠিলেন এবং ছাতা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তুমি বই গুছাইয়া লইলে এবং তোমাদের পাড়ার সেই-যে ছেলেটি দূরের বেঞ্চে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি চীৎকার করিয়া ডাকিলে। সে তোমার কাছে আসিল। তার পরে দু'জনে গল্প করিতে করিতে তোমরা বাড়ীতে ফিরিলে। খুব মজা নয় কি ?

ছুটির ঘণ্টার মত মিষ্টি আওয়াজ আর কারো নাই। তার পরে যখন অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলার গল্প করা যায় সে-ও বেশ মিষ্টি লাগে। কিন্তু দারোয়ান্ স্কুলের গেটের কাছে যে ঘড়ি পিটাইল তাহাতে কি-রকমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া তোমার কানে পৌঁছিল, তাহা বলিতে পার কি ? তুমি গলার ভিতরকার বাতাসকে কি এক-রকম নাড়া-চাড়া করিলে এবং তোমার গলা হইতে "মা" বলিয়া একটা শব্দ বাহির হইল,—মা তাহা ও-ঘর হইতে শুনিয়া এ-ঘরে তোমার কাছে আসিলেন। এই ব্যাপারটাই বা কি-রকমে ঘটিল,—ইহাও আশ্চর্য্য নয় কি ? অনেক দূরে আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কাইল। সেখানে কি হইল জানি না,—কিন্তু একটু পরেই কামানের আওয়াজের মত শব্দ কানে পৌঁছিল,—এটাও আশ্চর্য্যের কথা নয় কি ?

কি-রকমে শব্দ উৎপন্ন হয় এবং তাহা কি-রকমে আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছে, সেই কথাগুলিই তোমাদিগকে বলিব।

শব্দ কি-রকমে উৎপন্ন হয় বুঝিতে হইলে, জলের ঢেউ কি-রকমে হয় জানা দরকার। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, জ্যৈষ্ঠ মাসের গুমট দিনের বিকাল বেলায় তোমাদের পুকুরের জল স্থির হইয়া আছে, কোথাও একটু ঢেউ নাই। তুমি যেন সেই জলে একটা ঢিল ফেলিয়া দিলে। ইহাতে জলের অবস্থা কি-রকম হয়, দেখ নাই কি? যেখানে ঢিল পড়ে সেখানকার জল চঞ্চল হইয়া উঠে। তার পরে সেই জায়গার চারিদিকে একটির পর একটি চাকার মত ঢেউ চলিতে আরম্ভ করে এবং শেষে সেই ঢেউ তোমাদের বাঁধা ঘাটের সিঁড়িতে আসিয়া ধাক্কা দেয়।

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, যেখানে ঢিল ফেলা গেল সেইখানকারই জল ঢেউয়ের আকারে ধীরে ধীরে আসিয়া ঘাটের সিঁড়িতে ধাক্কা দেয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। যেখানে ঢিল পড়ে হঠাৎ ধাক্কা পাইয়া সেখানকার জল একটু উঁচু হইয়া দাঁড়ায়। ধূলা বা বালি গাদা করিয়া রাখিলে, তাহা যেমন বহুকাল উঁচু হইয়াই থাকে জল সে-রকমে উঁচু হইয়া থাকিতে পারে না। উঁচু হইয়াই তাহা তখনি জোরে নীচে নামিতে থাকে। কোনো জিনিস জোরে নীচে নামিলে তাহা যাহার উপরে পড়ে তাহাকে ধাক্কা দেয়।

কাজেই উঁচু জল নীচে নামিবার সময়ে তাহার নীচেকার জলে ধাক্কা দেয় এবং ইহাতে পাশের জল নীচের দিক্ হইতে চাপ পাইয়া উঁচু হইয়া উঠে। এই-রকমে একটু দূরে আর একটা উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এক জায়গা হইতে আর এক জায়গায় যে-সব ঢেউ চলা-ফেরা করে সেগুলি এই-রকমেই চলে।

ইহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, পুকুরের জলে ঢিল ফেলিলে যে ঢেউ হয়, তাহাতে এক জায়গার জল আর এক জায়গায় ঢেউয়ের সঙ্গে চলিয়া যায় না। এক জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া জল একবার উঁচু এবং আর একবার নীচু হইতে থাকে, ইহাতেই ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। তোমরা যদি ভালো করিয়া দেখ, তবে জানিতে পারিবে, পুকুরের জলে যে ফুল বা লতাপাতা ভাসিতে থাকে, তাহা কখনই জলের ঐ-রকম ঢেউয়ে দূরে যায় না। জল যেমন উঁচু-নীচু হয়, সেগুলি একই জায়গায় দাঁড়াইয়া জলের সঙ্গে তালে তালে সেই-রকম উঁচু-নীচু হয় মাত্র।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদি তোমরা বুঝিয়া থাক,—তবে শব্দ কি-রকমে উৎপন্ন হয়, এখন তাহাও তোমরা বুঝিবে।

পুকুরের জলে কোনো জায়গায় ঢিল ফেলিলে যেমন সেখান হইতে ঢেউ উৎপন্ন হয়, তোমাদের স্কুলের বড় পেটা-ঘড়িটাকে মুগুর দিয়া পিটাইলে সেখান হইতে সেই-রকম-

ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ,—জলে ঢেউ হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু শুক্‌না খট্‌খটে ঘরে ঘণ্টা বাজাইলে সেখানে কোথা হইতে ঢেউ হইবে? কিন্তু সত্যই ঢেউ হয়। ডাঙায় জল নাই সত্য, কিন্তু সব জায়গা জুড়িয়া বাতাস আছে। ঘড়ি পিটাইলে যে ঢেউ হয়, সে বাতাসেরই ঢেউ।

কেবল ঘড়িই যে বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, তাহা নয়। যখন কলের বাঁশি বাজে, যখন রাস্তায় গাড়ী চলে, যখন ফেরিওয়ালা "বরফ চাই" বলিয়া হাঁক দেয়, তুমি যখন গলা ছাড়িয়া পড়া মুখস্থ কর এবং বাড়ীর সেই পোষা বিড়ালটা যখন মিউ-মিউ করিয়া ডাকে,—তখনো বাতাসে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। বাতাস দেখা যায় না, কাজেই তাহার ঢেউও দেখা যায় না। দেখা গেলে জানিতে পারিতে,—পাখীর ডাকের, মানুষের চীৎকারের এবং আরো কত শব্দের ঢেউয়ে সমস্ত আকাশটা ভরিয়া আছে।

শব্দের ঢেউ কি-রকমে উৎপন্ন হয়, এখন সেই কথাটা বলিব। মনে কর, তোমাদের কাঁসার বড় বাটিটা হাত ফস্‌কাইয়া যেন হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া শব্দ করিতে লাগিল। কি বিশ্রী আওয়াজ! তুমি তাহাতে হাত দিয়া শব্দ বন্ধ করিয়া দিলে। শব্দ করিবার সময়ে এই সকল জিনিস যে কাঁপে তাহা তোমরা দেখ নাই কি? হাত ছোঁয়াইলেই কাঁপুনি বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শব্দও বন্ধ হয়। কেবল কাঁসার বাটিই যে কাঁপিয়া শব্দ উৎপন্ন করে, তাহা

নয়। যেখানে শব্দ হয়, সেখানে কোনো একটা জিনিস কাঁপিয়াই শব্দের সৃষ্টি করে। যখন কাঁসার ঘণ্টা এবং পেটা-ঘড়ি বাজে, তখন হাত দিয়া দেখিলে সেগুলির কাঁপুনি তোমরা স্পষ্ট বুঝিতে পরিবে। তুমি যখন কথা বল তখন গলার ভিতরকার একটা বিশেষ যন্ত্র কাঁপে ; বেহালা হইতে যখন সুর বাহির হয়, তখন তারগুলি কাঁপে ; রাস্তার উপর দিয়া যখন গাড়ী চলিয়া যায়, তখন তাহার চাকা কাঁপে এবং ঘোড়ার খুরের ধাক্কায় রাস্তর পাথর কাঁপে ; তবলায় চাঁটি দিলে বা ঢাক-ঢোল বাজাইলে সেগুলির উপরকার চামড়া কাঁপে।

কোনো জিনিসের কাঁপুনি কি-রকমে শব্দের উৎপত্তি করে, এখন তাহাই বুঝিতে হইবে। মনে কর, স্নানের সময়ে তুমি চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবাইয়া হাতখানিকে কাঁপাইতেছ। ইহাতে হাতের কাঁপুনির সঙ্গে পাশের জল ধাক্কা পাইয়া কাঁপিয়া উঠিবে না কি ? নিশ্চয়ই কাঁপিবে, তোমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। আমরা কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া বা ঢাক-ঢোল পিটিয়া যখন কাঁপুনির সৃষ্টি করি, তখন তাহাতে চারিপাশের বাতাসও কাঁপিয়া উঠে। তার তরে উহাই জলের ঢেউয়ের মত চারিদিকে ছুটিয়া চলে। জল উঁচু-নীচু হইয়া যেমন ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, বাতাস ঠিক্ সে-রকমে ঢেউ উৎপন্ন করে না। বর্ষার দিনে কেঁচো কি-রকমে মাটির উপর দিয়া চলে,—তোমরা দেখ নাই কি ? সে দেহটিকে একবার কুঁচ্‌কাইয়া পরক্ষণেই লম্বা করিয়া ফেলে,—ইহাতে

সে সম্মুখের দিকে আগাইতে পারে। বাতাসের ঢেউকে কতকটা কেঁচোর চলার মত বলা যাইতে পারে। যে-জিনিস কাঁপিতেছে, তাহার কাঁপুনির ধাক্কায় পাশের বাতাস একবার

ঘণ্টার শব্দের ঢেউ।

সঙ্কুচিত হইয়া পরক্ষণেই প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং তার পরে সেই বাতাসই আবার তাহার পাশের স্থির বাতাসকে সেই-রকমে কাঁপাইতে থাকে। এই-রকমে জলের ঢেউয়ের মত একটা বাতাসের ঢেউ চারিদিকে ছুটিয়া চলে। এই ঢেউ-ই শব্দের ঢেউ। ইহা আমাদের কানের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলে আমরা শব্দ শুনিতে পাই।

সুতরাং বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, বাতাসের ঢেউ-দ্বারাই শব্দের সৃষ্টি হয়, এবং বাতাসই শব্দকে বহিয়া কানে পৌঁছাইয়া দেয়। যেখানে বাতাস থাকে না,—সেখানে শব্দও হয় না। একটা কাচের ফাঁকা গোলার মধ্য হইতে বাতাস বাহির করিয়া যদি সেখানে খুব জোরে ঘণ্টা বাজানো যায়, তাহা হইলে একটুও শব্দ হয় না। তোমরা বড় হইয়া যখন বিজ্ঞানের বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই-সব পরীক্ষা নিজেরাই করিতে পারিবে।

রঙিন্ আলো

দেয়ালগিরি ও ঝাড়-লণ্ঠনে যে-সব তে-শিরে কাচ ঝুলানো থাকে, তোমরা হয় ত তাহা দেখিয়াছ। তোমাদের কাহারো কাহারো বৈঠকখানা-ঘরে হয় ত ঐ-রকম কাচ দেয়ালগিরিতে লাগানো আছে। তে-শিরে কাচের উপরে রৌদ্র পড়িলে, তাহাতে কি সুন্দর রঙ্ই দেখা যায়। তখন লাল গোলাপী সবুজ নীল বেগুনে প্রভৃতি রামধনুর সব রঙ্গুলিই যেন দেয়ালের গায়ে পড়ে। আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন দেয়ালগিরির একখানা ভাঙা কাচ পাইলে যে কি আনন্দ হইত, তাহা আজও মনে আছে।

তার পরে জলে তেল ফেলিলে জলের উপরে যে তেলের সর ভাসে,—তাহাতে কত রকম রকম রঙ্ ক্ষণে দেখা দেয় এবং ক্ষণে মিলাইয়া যায়,—ইহা তোমরা দেখ নাই কি? স্নানের সময়ে তোমরা যখন সাবানের ফেনা গায়ে মাখো, তখন রৌদ্র পাইলে ফেনাগুলি ঠিক্ ঐ-রকমই নানা রঙের সৃষ্টি করে। ঘাস বা পাতার ডগায় প্রাতঃকালে যে-সব শিশিরের বিন্দু ঝুলিতে থাকে, সূর্য্যের আলোয় তাহাতে যে-সব রঙ্ দেখা যায়, সেগুলিও হয় ত তোমরা দেখিয়াছ।

সূর্য্যের সাদা আলো তে-শিরে কাচ বা সাবানের ফেনায় পড়িলে কেন রামধনুর মত হাজার রঙের সৃষ্টি করে, সেই কথাটাই তোমাদিগকে বলিব।

ঈথরের খুব ছোট ছোট ঢেউ চোখে আসিয়া ধাক্কা দিলে, আমরা আলো দেখি, এই কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। তোমরা বোধ হয় তখন মনে করিয়াছিলে, সূর্য্য হইতে বা অন্য আলো হইতে বুঝি একই আকারের ঢেউ বাহির হইয়া আমাদের চোখে ধাক্কা দেয়। কিন্তু তাহা নয়। পুকুরের স্থির জলে এলোমেলো ভাবে ঢিল ছুড়িলে, সকল ঢিলে একই রকমের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় কি? কখনই হয় না। ছোট ঢিলে ছোট ঢেউ এবং বড় ঢিলে উঁচু-উঁচু বড় ঢেউ উৎপন্ন হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আগুনের ভিতরকার বাষ্পের অণু-পরমাণু নানা-রকমে কাঁপিয়া যখন ঈথরে ঢেউ তোলে, তখন তাহাতেও একই রকমের ঢেউ উঠে না। সেখানে ছোট বড় নানা-রকমের ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং সেগুলি একত্র জটলা করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল বেগে ছুটিয়া চলে।

পুকুরের জলের ছোট ঢেউ এবং বড় ঢেউয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় ঢেউ জোরে ধাক্কা দেয় এবং ছোট ঢেউ আস্তে আস্তে ধাক্কা দেয়, কেবল এই তফাৎটাই আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ঈথরের ছোট এবং বড় ঢেউয়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। ইহাদের মধ্যে যেগুলি খুব ছোট তাহারা এক ইঞ্চিকে উনচল্লিশ হাজার ভাগ করিলে যতটুকু হয় ততখানি লম্বা। কেবল এই ঢেউ যদি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে, তবে আমরা

বেগুনে আলো দেখিতে পাই। ইহার চেয়ে যেগুলি একটু বড় তাহা আমাদিগকে নীল আলো দেখায়। এই-রকমে ঢেউ যেমন একটু-একটু করিয়া লম্বা হয়, তেমনি তাহাদের প্রত্যেকটি হইতে আমরা নীল সবুজ হলুদ লাল প্রভৃতি রঙ্ দেখিতে পাই। যে ঢেউয়ে আমরা লাল রঙ্ দেখি, লম্বায় সেইগুলিই সকলের চেয়ে বড়। সাড়ে-পঁয়ত্রিশ হাজার লাল রঙের ঢেউ গায়ে গায়ে মিলিলে এক ইঞ্চি লম্বা হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, সাধারণ আলোর ঢেউয়ে যদি এতই রকম-রকম ঢেউ মিশানো থাকে, তবে আমরা কেন সূর্য্যের আলো বা প্রদীপের আলোতে ঐ-সব রঙ্ দেখিতে পাই না? বৈজ্ঞানিকগণ এই কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা বড় মজার। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যখন লাল গোলাপী হলুদ সবুজ ইত্যাদির ছোট-বড় সব ঢেউ এক সঙ্গে আসিয়া চোখে ধাক্কা দেয় তখন আমরা ধবধবে সাদা আলো দেখি। সূর্য্যের বা প্রদীপের আগুন হইতে সব-রকম ঢেউ এক সঙ্গে বাহির হয় এবং সেগুলি একই সঙ্গে আসিয়া চোখে পড়ে, তাই ঐ-সব আলো সাদা। সুতরাং জানিয়া রাখ,—লাল হলুদ সবুজ ইত্যাদির ঢেউ এক সঙ্গে চোখে ধাক্কা দিলে আমরা কেবল সাদা রঙ্ই দেখি।

পূজার সময়ে বা দেয়ালির রাত্রিতে তোমরা যে লাল ফুলঝুরি জ্বালাও, তাহার আলো কেমন সুন্দর লাল হয়,

তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই আলোর আগুন হইতে যে-সব ঢেউ বাহির হয়, তাহাতে ছোট-বড় সব-রকমের ঢেউ মিশানো থাকে না—যে ঢেউয়ে লাল রঙ্ দেখায়, কেবল সেই-গুলিই আগুন হইতে বাহির হইয়া তোমার এবং আমার চোখে ধাক্কা দেয়। তাই আমরা কেবল লাল রঙ্ই দেখি। সবুজ আলোর ফুলঝুরিও বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। তোমরা ইহার আলো দেখ নাই কি? আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন অনেক ফুলঝুরি পোড়াইয়াছি। এগুলি হইতে কেন সবুজ আলো বাহির হয়, এখন তোমরা নিজেরাই বলিতে পারিবে। সবুজ ফুলঝুরিতে আগুন দিলে লাল হলুদ নীল প্রভৃতি রঙের ঢেউ ঈথরে জন্মে না,—যে ঢেউ চোখে ধাক্কা দিলে সবুজ রঙ্ দেখায়, কেবল সেই-রকমের ঢেউ উৎপন্ন হয়। কাজেই সেগুলি যখন ফুলঝুরির আগুন হইতে বাহির হইয়া তোমাদের চোখে ধাক্কা দেয়, তখন তোমরা কেবল সবুজ আলোই দেখিতে পাও।

এক-রকম ঢেউ চোখে পড়িয়া কেন লাল আলো দেখায় এবং অন্য এক-রকম ঢেউয়ে কেন বেগুনে বা অপর রঙ্ দেখা যায় তোমরা বোধ হয় এখন তাহাই জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো কথা তোমাদিগকে এখন বলিব না। বড় বড় পণ্ডিত এই ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষা করিতেছেন কিন্তু তথাপি ছোট-বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় ভিন্ন ভিন্ন রঙ্

কি-রকমে চোখে ফুটিয়া উঠে তাহা ঠিক জানা যায় নাই। বেহালা বা এস্‌রাজ বাজাইলে কেমন মিষ্ট শব্দ বাহির হয়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ,—যেন কান জুড়াইয়া যায়। তার পর গাধার চীৎকার কি বিশ্রী তাহাও বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। গাধা আকাশপানে মুখ তুলিয়া আনন্দে গান জুড়িয়া দিলে, কানে আঙুল দিতে হয়। গাধার ডাক এবং বেহালার আওয়াজ দুই-ই শব্দ,—তবে কেন একটা শব্দ ভালো এবং আর একটা শব্দ মন্দ লাগে, তাহা বলা কঠিন। সেই-রকম একই ঈথরের এক-রকম ঢেউয়ে আমরা কেন লাল রঙ্‌ দেখি এবং আর এক-রকমে কেন হল্‌দে দেখি, তাহার উত্তর দেওয়াও কঠিন। তোমরা বড় হইয়া এ-সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবে।

যাহা হউক, আলোর নানা-রকম ঢেউ-সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিলাম, তোমরা বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছ। যদি বুঝিয়া থাক,—তবে তে-শিরে কাচ, সাবানের ফেনা বা শিশিরের বিন্দুর ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো বাহিরে আসিলে, তাহাতে কেন এত সুন্দর রঙ্‌ হয়, তাহাও তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, কাক বক শালিক কোকিল ফিঙে বাবুই চড়াই সব পাখীর এক জায়গায় নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ইহারা সকলে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক বাঁধিল এবং ভয়ানক কিচির-মিচির করিতে

করিতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিল। ছোট-বড় পাখীদের এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ খাইতে চলা এবং ঈথরের ছোট-বড় ঢেউয়ের এক সঙ্গে ছুটিয়া আসা একই ব্যাপার নয় কি? পাখীর ঝাঁকে চিল শকুন ও কাকের মত বড় পাখী এবং চড়াই বাবুইয়ের মত ছোট পাখী থাকে। সূর্য্য হইতে বা প্রদীপ হইতে যে আলোর ঢেউ ছুটিয়া আসে, তাহাতেও লাল হল্‌দে রঙের বড় ঢেউ এবং বেগুনে প্রভৃতি রঙের ছোট ঢেউও থাকে। এখন মনে কর, যে জঙ্গলে নিমন্ত্রণ ছিল, পাখীরা ঝাঁক বাঁধিয়া সেখানে পৌঁছিয়া ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হইয়া পড়িল। কাকেরা একটা ছোট গাছে চড়িয়া "কা-কা" সুরু করিয়া দিল, ফিঙেরা বাঁশ-ঝাড়ের আগ্-ডালে লেজ ঝুলাইয়া বসিয়া শিশ্ দিতে লাগিল এবং শালিকেরা নিম-গাছের পাতার আড়ালে জমা হইয়া গলা ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া "কোঁকর-কোঁকর—আচ্চা-আচ্চা" অর্থাৎ "শীঘ্র খাবার চাই" বলিতে আরম্ভ করিল। এখন তোমরা আর পাখীর ঝাঁক দেখিতে পাইবে না,—ভিন্ন-ভিন্ন গাছে পাখী-দের ভিন্ন-ভিন্ন দলই দেখিবে। সূর্য্যের আলোর লাল নীল সবুজ প্রভৃতি সকল রঙের ছোট-বড় ঢেউ তে-শিরে কাচের ভিতরে যাইবার সময়ে পাখীর ঝাঁকের মতই এক সঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু কাচ হইতে বাহির হইবার সময়ে সে-ঝাঁক আর থাকে না। তখন লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি প্রত্যেক ঢেউ আলাদা হইয়া আলাদা রাস্তা ধরিয়া তোমাদের

চোখে আসিয়া পড়ে। কাজেই এই সময়ে তোমরা লাল আলোর বড় বড় ঢেউতে লাল, সবুজের ঢেউতে সবুজ, এবং নীল ইত্যাদির ঢেউতে নীল রঙ্ ইত্যাদি দেখিতে পাও।

সূর্য্যের ও প্রদীপের সাদা আলো যে কেবল তে-শিরে কাচের ভিতর দিয়া আসিলেই পৃথক্ হয়, তাহা নয়। ভোরের বেলায় পাতায় পাতায় যে শিশিরের বিন্দু ঝুলিতে থাকে, তাহার ভিতর দিয়া আসিবার সময়েও সূর্য্যের সাদা আলোর ভিতরকার সব ঢেউ পৃথক্ হইয়া যায়। সাবানের ফেনাতেও তাহাই হয়। এইজন্যই তোমরা শিশির-বিন্দু এবং সাবানের ফেনাতে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি নানা রঙ্ দেখিতে পাও।

তোমরা আকাশে রামধনু দেখ নাই কি? কি সুন্দর রঙ্! লাল, কমলা, জরদা, সবুজ, নীল—কতই রঙ্ই সেই আকাশ-জোড়া ধনুকের গায়ে থাকে-থাকে সাজানো দেখা যায়। এ-সব রঙ্ কোথা হইতে আসে, এখন বোধ হয় তোমরা তাহা নিজেরাই বলিতে পারিবে। আমরা যাহাকে মেঘ বলি, তাহা কতকগুলি ছোট-ছোট জলের বিন্দু ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুয়াসার ভিতরে বেড়াইলে কাপড়-চোপড় ভিজিয়া যায়। তোমরা যদি এরোপ্লেনে চড়িয়া মেঘের ভিতরে বেড়াইতে যাও, তবে সেখানেও মেঘের জলে তোমাদের কাপড়-জামা ভিজিয়া যাইবে। মেঘের এই-সব ছোট বিন্দু যখন বড় বড় বিন্দু হয় তখন সেগুলিই জলের

ফোঁটা হইয়া দাঁড়ায়। সূর্য্যের সাদা আলো যখন এই সকল ফোঁটার ভিতর দিয়া বাহিরে আসে, তখন তাহার লাল নীল সবুজ রঙের ঢেউগুলি আলাদা হইয়া যায়। কাজেই এই ঢেউগুলি চোখে ধাক্কা দিয়া আকাশের গায়ে লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি রঙ্ দেখাইতে আরম্ভ করে।

রঙের খেলা

বসন্ত কালে গাছে গাছে যে-সব নূতন পাতা গজাইয়া উঠে তাহার রঙ্ কেমন সুন্দর! দেখিলে যেন চোখ জুড়াইয়া যায়। ফুলে-ফলেও আমরা কত রঙ্ই দেখিতে পাই। জবা শিমুল কৃষ্ণচূড়া টকটকে লাল। করবী ও গোলাপের রঙ্—ফিকে লাল। আবার কুন্দ মালতী চামেলী ও বেলার রঙ্—ধব্‌ধবে সাদা। পশুপাখী প্রজাপতিদের গায়ের রঙের কতই বাহার! কাহারো রঙ্ হলুদ, কাহারো সবুজ, কাহারো আবার ছিটে-ফোঁটা। ময়ূরের গলার পালকে এবং মাছরাঙা ও নীলকণ্ঠ পাখীর গায়ে হাজার রঙের ঝিলিক দেখা যায়। এ-সংসারটা যেন রঙেরই খেলার জায়গা—মাঠ ঘাট আকাশকে জুড়িয়া যেন দিবারাত্রি কেবল রঙেরই খেলা চলিতেছে। এই-সব রঙ্ কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তোমাদের জানিতে ইচ্ছা করে না কি? এই খাতাটার দিকে তাকাইয়া কেন তুমি ইহাকে সাদা দেখিলে এবং ঐ বইখানার দিকে তাকাইয়া কেন তাহাকে লাল দেখিলে,—বলিতে পার কি? বোধ হয় পার না। তোমাদিগকে আজ সেই-সব কথাই বলিব।

রাত্রিতে সব জিনিসই অন্ধকারে ঢাকা ছিল,—কিছুই দেখা যাইতেছিল না। সূর্য্যের উদয় হইল, অমনি ঘরের ভিতরকার চেয়ার টেবিল বাক্স সকলি তোমরা দেখিতে পাইলে। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিলেও ঠিক এই-রকমটিই

হয়,—তখন ঘরের সব জিনিসই নজরে পড়ে। কেন এমন হয় তোমরা বোধ হয় জানো না। সেই কথাটাই তোমাদিগকে আগে বলিব। ইহা বুঝিলে, তোমরা রঙের কথাটা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

রবারের বল্ জোরে মাটিতে বা দেওয়ালের গায়ে ফেলিয়া তোমরা প্রতিদিনই অনেক-রকম খেলা কর। এই-সব খেলায় মাটিতে বা দেওয়ালে ধাক্কা পাইয়া বল্ লাফাইয়া উঠে, তার পরে সেটাকে ধরিবার জন্য তোমরা কত লাফালাফি, কত দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি কর। জোরে ধাক্কা পাইলে লাফাইয়া উঠা কেবল যে রবারের বলে বা তোমাদের ফুট্‌বলেই দেখা যায়, তাহা নয়। অনেক জিনিসই ধাক্কা পাইলে লাফাইয়া চলে। তোমাদের খেলার মাঠটা কি-রকম তাহা দেখি নাই। মনে কর, মাঠের সম্মুখে দূরে একটা বাড়ীর উঁচু প্রাচীর আছে। তুমি মাঠে দাঁড়াইয়া খুব জোরে চীৎকার করিলে। ইহার একটু পরেই তোমার গলার আওয়াজের ঠিক সেই-রকম চীৎকারের শব্দ তোমার কানে আসিয়া পৌঁছিল। ইহা তোমরা শুন নাই কি? ইহাকে প্রতিশব্দ বলে। খেলিবার বল্ যেমন প্রথমে প্রাচীরে বা মাটিতে ঠেকে এবং তার পরে লাফাইয়া তোমার হাতে আসিয়া দাঁড়ায়,—শব্দও তাহাই করে। তোমার মুখ হইতে বাহির হইয়া চীৎকারের ঢেউ প্রথমে প্রাচীরে গিয়া ধাক্কা পায়। তার পরে বলের মত ফিরিয়া তোমার কানে

পৌঁছে। তাই একবার চীৎকার করার পরে, তোমরা ঠিক্ সেই চীৎকারের শব্দই আর একবার শুনিতে পাও।

খেলার বল্ এবং চীৎকারের শব্দ যেমন দেওয়ালে ধাক্কা পাইয়া ফিরিয়া আসে, আলোর ঢেউও ধাক্কা পাইয়া সেই-রকমে চলা-ফেরা করে। তোমরা বোধ হয় এই কথাটা বুঝিলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। মনে কর, তোমাদের বাড়ীর আঙিনায় একখানি সাদা কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে,—তুমি যেন বারান্দায় বসিয়া আছ। সূর্য্যের আলোর ঢেউ কাপড়ের উপরে পড়িয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায় না; তোমাদের খেলার বলেরই মত তাহা কাপড়ে ধাক্কা পাইয়া উপরে নীচে আশে-পাশে ছড়াইয়া পড়ে। এই ছড়ানো ঢেউয়ের কতকগুলি যখন তোমার চোখে আসিয়া পড়ে, তখনি তুমি কাপড়খানিকে দেখিতে পাও।

রৌদ্রে মেলিয়া দেওয়া কাপড়কেই যে কেবল এই-রকমে দেখা যায়, তাহা নয়। কাগজ, পেন্‌সিল, বই, ম্যাপ, গোরু-বাছুর ইত্যাদি যে-কোনো জিনিসকে যখন তোমরা দেখ, তখন ঠিক্ এই-রকমেই দেখিয়া থাক। অর্থাৎ প্রথমে আলোর ঢেউ সেই জিনিসের উপরে আসিয়া পড়ে, তার পরে তাহাই যখন সেখান হইতে রবারের বলের মত ঠিক্‌রাইয়া তোমাদের চোখে আসিয়া পড়ে তখন তোমরা ঐ-সব জিনিসকে দেখিতে পাও।

তোমরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার,—ঘরের ভিতরে

বা ছায়াতে যে-সব জিনিস থাকে তাহাতে রৌদ্র লাগে না, কাজেই সেগুলি হইতে আলোর ঢেউ ঠিক্‌রাইয়া চোখে পড়ে না,—তথাপি আমরা ঘরের ভিতরকার বা ছায়ার জিনিস-পত্র-গুলিকে কেমন করিয়া দেখিতে পাই? যদি একটু ভাবিয়া দেখ, তবে এ-সব কথার উত্তর তোমরা নিজে-নিজেই দিতে পারিবে। বাহিরের আলো তোমরা ঘরের ভিতরে আসিতে কখনই দেখ নাই কি? আয়নায় রৌদ্র ফেলিয়া, সেই রৌদ্রকে অনায়াসে ঘরের ভিতরে আনা যায়। আমরা ছেলেবেলায় আয়নায় রৌদ্র ফেলিয়া এই-রকমে অনেক খেলা করিয়াছি,—তোমরাও হয় ত করিয়াছ। সূর্য্যের আলো ঘরের ও ছায়ার ভিতরকার জিনিস-পত্রে ঐ-রকমেই আসিয়া পড়ে। আয়নার উপরে পড়িয়া আলো যেমন ঘরের ভিতরে আসে, বাহিরের মাটি দেওয়াল গাছপালার উপরে পড়িয়া তাহা তেমনি ঠিক্‌রাইরা ঘরে এবং ছায়ায় আসিয়া হাজির হয়। তার পরে উহাই যখন ঘরের ভিতরকার জিনিস-পত্রে আবার ধাক্কা পাইয়া চোখে আসিয়া পড়ে, তখন আমরা সেই-সব জিনিসকে দেখিতে পাই।

আলো-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। নানা জিনিসের নানা রঙ্ তোমরা কেন দেখিতে পাও, এখন সেই কথাটা বলিব। গাছের পাতার রঙ্ সবুজ, তোমার গায়ের কাপড়-খানার রঙ্ লাল, আবার টেবিলের উপরকার ঐ বইখানার রঙ্ নীল। কেন এই নানা-রকম রঙ্ দেখা যায়? এ-সব

রঙ্ কোথা হইতে আসে, তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ইহার উত্তরে হয় ত বলিবে, ঐ-সব জিনিসের গায়ে রঙ্ লাগানো আছে, তাই সেই-সব রঙ্ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়। তোমরা যখন ফুলঝুরি জ্বালাইয়া লাল আলো কর,—তখন সত্যই তাহা হইতে লাল আলোর ঢেউ বাহির হয় এবং তাহা চোখে ধাক্কা দিয়া লাল আলো দেখায়। ঐ যে লাল রঙের বইখানা দেখিতেছ, তাহা ফুলঝুরির মত জ্বলিয়া পুড়িয়া লাল আলোর সৃষ্টি করিতেছে না। তবে কেন উহা লাল দেখাইবে?

এই-সকল কথার উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলেন, তাহা বড় মজার। তোমরা আগেই শুনিয়াছ, সূর্য্যের বা প্রদীপের সাদা আলো কখনই এক-রঙা নয়। তাহাতে সবুজ নীল বেগুনে ইত্যাদি অনেক রঙিন্ আলোর ঢেউ মিশানো থাকে। সব রঙের ঢেউ এক সঙ্গে চোখে পড়ে বলিয়া আমরা উহাকে সাদা দেখি। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, তোমার লাল বইখানির উপরে যখন সাদা আলো আসিয়া পড়ে, তখন ঐ আলোর ভিতরকার লাল জরদা সবুজ নীল বেগুনে প্রভৃতির সব ঢেউ বই হইতে ঠিক্‌রাইয়া তোমার চোখে পড়ে না। বইখানা তখন সব ঢেউ শুষিয়া লইয়া কেবল লাল রঙের ঢেউগুলিকে ঠিক্‌রাইয়া চোখে ফেলিতে আরম্ভ করে। কাজেই তখন আমরা বইয়ের রঙ্ কেবল লালই দেখিতে থাকি। যে-সব জিনিসকে তোমরা রঙিন্

দেখ, তাহাদের প্রত্যেকটি ঠিক্ এই-রকমেই সাদা আলোর কতক রঙ্‌কে শুষিয়া লইয়া, বাকি দুই একটা তোমাদের চোখে ফেলে। তাই ঐ-সব জিনিসকে রঙিন্ দেখায়। গাছের পাতার রঙ্ সবুজ; ইহা তোমরা সর্ব্বদা দেখিতেছ। সূর্য্যের সাদা আলোর সাত-রঙা ঢেউ পাতায় পড়িলে, সবুজ রঙের ঢেউ ছাড়া আর সব ঢেউকেই পাতাটি শুষিয়া নষ্ট করে। কাজেই তখন সবুজের ঢেউ পাতা হইতে ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে পড়ে,—আর আমরা তাহাকে কেবল সবুজই দেখিতে থাকি। তোমাদের বাগানের গাছে যে হল্‌দে রঙের অতসী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার রঙ্ কেন হল্‌দে হইল, বোধ হয় এখন তোমরা নিজেরাই তাহা বলিতে পারিবে। সূর্য্যের সাদা আলো অতসী ফুলের উপরে পড়িলে, আলোর ভিতরকার লাল নীল সবুজ বেগুনে প্রভৃতি সব ঢেউকে ফুলগুলি শুষিয়া লয়,—কেবল হলুদ রঙের ঢেউকে শুষিতে পারে না। কাজেই অতসী ফুলকে আমরা হলুদ রঙের দেখি।

বড় মজার ব্যাপার নয় কি? এই যে হাজার হাজার রঙ্ মাখিয়া হাজার হাজার জিনিস আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটি সূর্য্যের সাদা আলো হইতে কতক রঙের ঢেউ শুষিয়া লইয়া কেবল দুই একটিকে আমাদের চোখে ফেলিতেছে এবং তাহাতেই পৃথিবী এমন সুন্দর হইয়াছে। সূর্য্যের আলোই এই সৌন্দর্য্যের মূল কারণ।

সাদা ও কালো জিনিস দেখিতে কি বিশ্রী! মাথার কালো চুল মন্দ দেখায় না,—কিন্তু অন্য কালো জিনিস ভয়ানক বিশ্রী। আবার হাড়ের মত ধব্‌ধবে সাদা জিনিসও দেখিতে ভালো নয়,—যেন চোখ টাটাইয়া উঠে। সাদা ও কালো রঙ্‌ আমরা কি-রকমে দেখি, তোমাদিগকে এখন সেই কথাটা বলিব। সাদা জিনিসে সূর্য্যের আলো পড়িলে, আলোর ভিতরকার কোনো রঙের ঢেউ তাহা শুষিয়া লইতে পারে না। ইহাতে সব রঙেরই ঢেউ সাদা জিনিস হইতে এক সঙ্গে ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে পড়ে। কাজেই আমরা জিনিসটির রঙ্‌ সাদা দেখি। রৌদ্রে সাদা কাপড় শুকাইতে দিলে তাহা কত উজ্জ্বল দেখায়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? সূর্য্যের আলোর সব ঢেউগুলি ঠিক্‌রাইয়া চোখে পড়ে বলিয়া, তাহা এত উজ্জ্বল। আয়নার উপরে সূর্য্যের আলো পড়িলে ঠিক্‌ তাহাই হয়। তখন আলোর সব ঢেউ ঠিক্‌রাইয়া চোখে পড়ে,—তখন আয়নার দিকে তাকানো কঠিন হয়।

সূর্য্যের আলো লইয়া সাদা জিনিস যে কাজ করে, কালো জিনিস ঠিক্‌ তারি উল্টা কাজ করে। কালো জিনিসে খুব উজ্জ্বল আলো পড়িলেও, তাহা হইতে একটা ঢেউও ঠিক্‌রাইয়া আসে না,—লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ প্রভৃতি সব ঢেউ তাহাতে পড়িয়া নষ্ট হয়। কাজেই তখন আলোর অভাবে এবং রঙের অভাবে আমরা জিনিসটাকেই কালো

দেখি। এই জন্যই কালো জিনিসকে বৈশাখের খুব রৌদ্রে রাখিলে বা ইলেক্‌ট্রিক্ আলোতে ধরিলে কখনই উজ্জ্বল দেখায় না। ইহা সব রঙের ঢেউকে রাক্ষসের মত গ্রাস করিয়া ফেলে। দেখ, কালো জিনিস কত বিশ্রী।

সবুজ কাচের চশমা চোখে দিলে প্রায় সব জিনিসকেই সবুজ দেখায় এবং লাল চশমায় লাল দেখায়। ইহা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। এখানে আলোর রঙের আর এক খেলা দেখা যায়। মনে কর, তোমাদের পড়িবার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, একখানা বই লইয়া তুমি আলো ও চোখের মাঝে ধরিলে। এখন আলো দেখিতে পাইবে কি? বইয়ের ভিতর দিয়া আসিয়া আলো কখনই তোমার চোখে পড়িবে না। কিন্তু চোখের সম্মুখে সাদা কাচ রাখিয়া আলোকে কখনই ঢাকা যাইবে না। এই জন্য কাচকে স্বচ্ছ জিনিস বলা হয়। বাতাস ও জলও কতকটা স্বচ্ছ। এই-রকম জিনিসের ভিতর দিয়া ছোট-বড় সব ঢেউ অনায়াসে বাহির হইয়া আমাদের চোখে ধাক্কা দেয়,—কোনো ঢেউ স্বচ্ছ জিনিসে আট্‌কায় না। রঙিন্ কাচ কিন্তু এ-রকম স্বচ্ছ নয়। কতকগুলি আলোর ঢেউকে আট্‌কাইয়া ইহা অন্য কতক-গুলিকে অবাধে বাহিরে আসিতে দেয়।

একটা উদাহরণ দিলে, বোধ হয় কথাটা সহজে বুঝিতে পারিবে। মনে কর, তুমি লাল কাচের চশমা চোখে দিয়াছ, ইহাতে যেন ঘরের সকল জিনিসই লাল দেখাইতেছে। এমন

কি তোমাদের সেই সাদা বিড়ালটাকেও দেখিয়া মনে হইতেছে যেন, সে লাল রঙ্ মাখিয়া বসিয়া আছে। ঘরের জিনিস-পত্র হইতে যে আলো তোমার চশমার উপরে পড়ে, তাহার সকল ঢেউ কাচের ভিতর দিয়া আসিতে পারে না। চশমার লাল কাচ, সবুজ হল্‌দে নীল ইত্যাদি সব ঢেউকে আট্‌কাইয়া ফেলে, কেবল লাল রঙের ঢেউকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই ইহাতে ঐ লাল-ঢেউ তোমার চোখে ধাক্কা দিয়া সব জিনিসকে লাল দেখায়।

আলোর এই লুকোচুরি খেলা মজার ব্যাপার নয় কি? সাদা আলোর ভিতরে রঙিন্ আলোর যে-সব ঢেউ লুকানো থাকে, সেগুলি যে কত নূতন নূতন রূপে আমাদের চোখে পড়ে, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

মেঘ ও বৃষ্টি

বিকালে মাঠে খেলা করিতেছিলে, এমন সময়ে আকাশে প্রকাণ্ড মেঘ উঠিল এবং ধূলা উড়াইয়া ঝড় আসিল। তোমরা তাড়াতাড়ি খেলা ফেলিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলে। তার পরেই ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি!

বৈশাখ মাসের বিকালে এই-রকম ঝড়-বৃষ্টি প্রায়ই হয়। তখন আর খেলাধূলা চলে না। তার পরে বর্ষাকালের কথা মনে করিয়া দেখ। সে-সময়ে কখনো কখনো দুই তিন দিন ধরিয়া অবিরাম বৃষ্টি হয়,—রাস্তাঘাট কাদায়-ভরা। কি বিশ্রী লাগে!

মেঘবৃষ্টি আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। কিন্তু আকাশে বৃষ্টির জল কি-রকমে জমা হয় এবং মেঘগুলাই বা কি-রকম জিনিস, তোমরা তাহা জানো কি? আমরা এখানে সেই-সকল কথাই তোমাদিগকে বলিব।

এই-সব বুঝিতে হইলে কোনো জিনিসকে গরম করিলে তাহার অবস্থা কি-রকম হয়, তাহা জানা দরকার।

মনে কর, তুমি যেন একটা ছোট লাহার বল্‌ আগুনে ফেলিয়া গরম করিতেছ। আগুনে রাখিলে লোহা এত গরম হয় যে, তাহাতে আর হাত রাখা যায় না। তোমার বল্‌ যেন সেই-রকমই গরম হইল।

এখন বলের ভিতরকার অবস্থা কি-রকম দাঁড়াইল, তোমরা বলিতে পার কি? বোধ হয় জানো না। গরম পাইবামাত্র তাহার ভিতরকার অণুগুলি ভয়ানক কাঁপিতে আরম্ভ করে। জিনিসের খুব ছোট ছোট অংশকে অণু বলে। এগুলি এত ছোট যে, আমাদের নজরে পড়ে না বা কোনো যন্ত্র দিয়াও দেখা যায় না। কাজেই গরম পাইয়া বলের অণু কাঁপিতেছে কিনা, তাহা তোমরা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেগুলি সত্যই কাঁপে। কোনো জিনিস যখন কাঁপিতে সুরু করে, তখন সে আগে যে-জায়গাটুকু জুড়িয়া ছিল, সেটুকুর মধ্যে কাঁপুনি চলে না। মনে কর, একটু সরু বাঁশ মাটিতে পুতিয়া, তোমরা তাহার গোড়ায় বার-বার ধাক্কা দিতে লাগিলে। বাঁশখানি একবার এদিকে এক-বার ওদিকে মাথা দোলাইয়া কাঁপিতে লাগিল। কাঁপিবার জন্য ইহার বেশী জায়গার দরকার হইবে না কি? দুইটি কাছাকাছি দেওয়ালের মাঝে যদি বাঁশখানি পুতিয়া থাক, তাহা হইলে কাঁপিবার সময়ে বাঁশের মাথা দেওয়ালে ধাক্কা দিতে থাকিবে। তোমার লোহার বলের ভিতরকার অণুগুলির অবস্থা ঠিক্ এই-রকমই হয়। খুব জোরে কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পারকে ধাক্কা দিয়া তাহারা অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ফেলে। কাজেই সমস্ত জিনিসটা ফুলিয়া উঠে। কেবল লোহার বল্ নয়, গরম হইলে সকল জিনিসই এই-রকমে ফুলিয়া আকারে বড় হয়। কানায় কানায় জলে ভর্ত্তি করিয়া

যদি একটি পাত্রকে তোমরা গরম কর, তবে দেখিবে, জলও ফুলিয়া উঠিতেছে এবং তাহা পাত্র হইতে উছলাইয়া পড়িতেছে। ফুট্‌বলের ব্লাডারে বাতাস পূরিয়া যদি উননের ধারে কিছুক্ষণ রাখিয়া দাও, তবে ব্লাডারের ভিতরকার বাতাস ফুলিয়া উঠিয়া ব্লাডার ছিঁড়িয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিবে।

এখন মনে কর, যেন তোমরা খানিকটা জল কড়াইয়ে রাখিয়া উননে গরম করিতেছ। তলার আগুনে জল গরম হইল, ফুটিতে আরম্ভ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে শুকাইয়া গেল। কিন্তু এতখানি জল শুকাইয়া কোথায় গেল তোমরা বলিতে পার কি? গরম হইলেই প্রত্যেক জিনিসের অণু কাঁপিয়া পৃথক্ হইতে চায়, এই কথা মনে রাখিলে তোমরা প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারিবে। গরম পাইবামাত্র কড়াইয়ের জলের অণুগুলি কাঁপিতে সুরু করিল। তার পরে যতই বেশি গরম পাইল, সেগুলির কাঁপুনি ততই বেশি হইতে থাকিল। শেষে অণুগুলির অবস্থা এ-রকম হইয়া দাঁড়াইল যে, তাহারা আর গায়ে গায়ে লাগিয়া কড়াইয়ের মধ্যে থাকিতে পারিল না,—বন্দুকের গুলি যেমন নলের মুখ হইতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হয়, তখন জলের অণুগুলি সেই-রকমে ছিট্‌কাইয়া বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল। কাজেই তখন আর কড়াইয়ে জল থাকিল না। এই-রকমে জল ছাড়িয়া জলের যে-সব অণু বাহিরে আসে, তাহাকে আমরা জলের বাষ্প বলি। এই বাষ্পে কেবল জলের অণুই থাকে। অণু

খুব ছোট জিনিস। এজন্য জলের বাষ্প আমরা দেখিতে পাই না।

তুমি স্কুলে যাইবে, বেলা হইয়া গিয়াছে,—বামুন ঠাকুর তাড়াতাড়ি তোমার পাতে গরম ভাত ঢালিয়া দিল। ভাত হইতে ধোঁয়ার মত ভাব্ উঠিতে লাগিল। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, এই ভাব্ই জলের বাষ্প। কিন্তু তাহা নয়। জলের বাষ্প চোখেই দেখা যায় না। ইহা ঠাণ্ডা পাইয়া জমাট বাঁধিলে ধোঁয়ার মত ঐ ভাবের সৃষ্টি হয়। সুতরাং বলিতে হয়, সেগুলি জলের ছোট ছোট কণা। ঠাণ্ডা-জলে-ভরা তোমার গ্লাসটা যদি ভাতের ভাবের উপরে কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখ, দেখিবে, গ্লাসের গায়ে শিশিরের মত জল জমিয়া রহিয়াছে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, হাঁড়িতে চাপাইয়া তলায় আগুন না জ্বালাইলে জল বাষ্প হয় না। কিন্তু তাহা নয়,—নদী, সমুদ্র, খাল, বিল, পুষ্করিণী, যেখানে যে-জল আছে, সূর্য্যের সামান্য তাপেই তাহা বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইতেছে। একখানি থালায় করিয়া খানিকটা জল দু'দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখ, দেখিবে, থালার জল দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। ভিজা কাপড় এক ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিলেই তাহার জল শুকাইয়া যায়। এই পৃথিবীতে যতটা ডাঙা আছে, তার তিনগুণ জায়গা জুড়িয়া সমুদ্র রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, প্রতিদিন কেবল সমুদ্র হইতেই কত জলের বাষ্প আকাশে

উঠিতেছে। ভারতবর্ষকে ঘিরিয়া যে মহাসমুদ্র আছে, প্রতিদিন তাহা হইতে প্রায় এক ইঞ্চি গভীর জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। যদি হিসাব কর, তবে দেখিবে এক বৎসরে কেবল ভারত মহাসাগর হইতেই প্রায় কুড়ি হাত জল বাষ্প হইতেছে। তাহা ছাড়া পৃথিবীর উপরে যে গাছ-পালা আছে, তাহা হইতে যে জলের বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহাও অল্প নয়।

কিন্তু এত জলের বাষ্প কোথায় যায়, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরা হয় ত বলিবে, ইহা পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশের অনেক উপরে চলিয়া যায়, তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা নয়। ঐ-সব বাষ্প আমাদের চারিদিকের বাতাসেই মিশিয়া থাকে। জলের বাষ্প চোখে দেখা যায় না,—দেখা গেলে, চারিদিকের বাতাসেই উহা তোমাদের নজরে পড়িত। গ্লাসে বরফের টুক্‌রা ফেলিয়া যখন জল ঠাণ্ডা করা যায়, তখন গ্লাসের গায়ে শিশিরের বিন্দুর মত জল জমে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? চারিদিকের বাতাসে যে জলের বাষ্প থাকে, তাহাই গ্লাসের ঠাণ্ডা গায়ে ঠেকিয়া জল হইয়া পড়ে। সকাল বেলায় ঘাসে ও পাতায় যে শিশির দেখা যায়, তাহা কি-রকমে উৎপন্ন হয়, তোমরা জানো না কি? তোমরা হয় ত মনে কর, রাত্রিতে যখন সকলেই ঘুমাইয়া থাকে তখন আকাশ হইতে টুপটাপ্‌ করিয়া শিশির পড়ে। কিন্তু তাহা নয়। রাত্রিতে গাছের পাতা ও

ঘাস তাপ ছাড়িয়া খুব ঠাণ্ডা হয়। তার পরে আশ-পাশের বাতাসে যে জলের বাষ্প থাকে, তাহাই ঠাণ্ডা ঘাস-পাতায় ঠেকিয়া জল হইয়া পড়ে। এই জলকেই আমরা ভোর বেলায় শিশিরের আকারে দেখি।

যাহা হউক, মেঘ কি-রকমে আকাশে জমে এখন সেই কথাটা তোমাদের বলিব। নদী সমুদ্র এবং গাছের ডালপালা হইতে সর্ব্বদাই যে জলের বাষ্প উঠিতেছে, তাহার সকলি মাটির উপরকার বাতাসে থাকিতে পারে না, ইহার অধিকাংশই বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আকাশের খুব উঁচু জায়গায় হাজির হয়। তোমরা বোধ হয় মনে কর, সূর্য্যের তাপে মাটি যেমন গরম হয়, আকাশের উপরকার বাতাস বুঝি তার চেয়ে অনেক গরম। কিন্তু তাহা নয়। আকাশের উপরটা খুবই ঠাণ্ডা। কাজেই জলের বাষ্প গরম বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া উপরকার ঠাণ্ডা জায়গায় গেলে, তাহা জমিয়া ছোট ছোট জলের কণা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা মাটিতে দাঁড়াইয়া অনেক দূরের এই-সব জলের কণাকে ধোঁয়ার মত দেখি। ইহাই মেঘ।

কিন্তু সকল সময়েই যে এই-রকমে মেঘের সৃষ্টি হয় তাহা নয়। মনে কর, সমুদ্র হইতে পঞ্চাশ-ষাট্ মাইল তফাতে একটা প্রকাণ্ড পাহাড় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং সমুদ্রের জলের বাষ্প যেন বাতাসে উড়িয়া পাহাড়ের উঁচু জায়গায় ধাক্কা পাইল। জলের বাষ্প এখানে

বাষ্পের আকারে থাকিতে পারিবে কি? কখনই পারিবে না। পাহাড়ের উঁচু জায়গা ভয়ানক ঠাণ্ডা। কাজেই সেখানে জলের বাষ্প জমিয়া মেঘ হইয়া পড়িবে। আমাদের বাংলা দেশের পূর্ব্বদিকে যে খাসিয়া পাহাড় আছে, তাহা বৎসরের সকল সময়েই মেঘে ঢাকা থাকে। সেখানে যে-রকম বৃষ্টি হয়, পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গায় সে-রকম হয় না। বৃষ্টি হইলে তাহার জল মাটির ভিতরে এবং নদী-সমুদ্রে চলিয়া যায়। এক জন হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন, খাসিয়া পাহাড়ে এক বৎসরে যে বৃষ্টি হয়, তাহার জল সেখানে জমা হইতে থাকিলে লোকের ঘর-বাড়ী আটাশ হাত উঁচু জলে ঢাকা পড়িত। ভাবিয়া দেখ, কত বৃষ্টিই সে-দেশে হয়। আমাদের বঙ্গ-উপসাগরে যে জলের বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঠাণ্ডা খাসিয়া পাহাড়ে ধাক্কা পায়,—তাই সেখানে এত মেঘ এবং এত বৃষ্টি!

মেঘ হইতে কি-রকমে বৃষ্টির ফোঁটা হয়, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব। মনে কর, একখানা প্রকাণ্ড মেঘ আকাশে ভাসিতেছে। এমন সময়ে কোনো দিক্ হইতে খুব ঠাণ্ডা বাতাস কিছু জলের বাষ্প সঙ্গে আনিয়া সেই মেঘে ধাক্কা দিল। এখন মেঘখানির অবস্থা কি-রকম হইবে, একবার ভাবিয়া দেখ। বাতাসে যে জলের বাষ্প ছিল, তাহা জমিয়া সেখানেই মেঘ হইয়া দাঁড়াইবে। কাজেই তখন মেঘের ভিতরকার জলের কণাগুলি আর ফাঁক-ফাঁক থাকিতে পারিবে

না। একটা পেয়ালা হইতে দুই ফোঁটা জল উঠাইয়া ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া রাখিলে কি হয়,—তাহা তোমরা দেখ নাই কি? তখন দুইটা ফোঁটা একত্র হইয়া একটা বড় ফোঁটা হইয়া দাঁড়ায়। এখানে সেই ধোঁয়ার মত জলের কণাগুলি ঘেঁসা-ঘেঁসি হইয়া পড়াতে, ঠিক্ তাহাই ঘটে। অর্থাৎ কণাগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়া এক-একটা জলের বিন্দু হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই আমাদের বৃষ্টির ফোঁটা। পৃথিবীর টানে সেগুলি যখন ঝুপ-ঝাপ করিয়া মাটিতে পড়ে, তখন আমরা বলি বৃষ্টি হইতেছে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—মেঘ যদি জলের কণা হয়, তবে সেগুলি উৎপন্ন হইবামাত্র, মাটিতে পড়ে না কেন? গরম ভাত এবং গরম দুধ হইতে যে ভাব্ উঠে, তাহাও জলের কণা। সেগুলি উৎপন্ন হইয়াই কি তোমাদের ভাতের থালা এবং দুধের বাটিতে ঝুপ-ঝাপ করিয়া পড়ে? কখনই পড়ে না। জল ভারি জিনিস হইলেও, তাহা যখন খুব ছোট ছোট কণার আকারে থাকে, তখন বাতাসে সেগুলি ভাসিয়া বেড়ায়। এই জন্যই সাধারণ মেঘ ঝুপঝাপ করিয়া মাটিতে পড়ে না।

মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি

আকাশের কত উপরে মেঘ হয়, কোন্ মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং কোন্ মেঘে বৃষ্টির ভয় থাকে না,—এসব কথা তোমাদের জানিতে ইচ্ছা হয় না কি? ছেলেবেলায় মেঘের সব খবর জানিবার জন্য যে কত কথা আমাদের বুড়ো ঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এখনো তাহা মনে আছে। বুড়ী আবল্-তাবল্ কত উত্তরই দিত। বৈশাখ মাসের সকালে পাত্লা মেঘ-গুলো যখন আকাশে উড়িয়া বেড়াইত, তখন সে বলিত ঐ মেঘেরা জঙ্গলে শালের পাতা খাইতে যাইতেছে। সত্যই তখন মনে হইত, মেঘেরা বুঝি আমাদেরই মত প্রাণী,—তাহারা আমাদেরি মত খাওয়া-দাওয়া করে, রাত্রি হইলে আকাশের নীচে গিয়া ঘুমায়। তার পরে যখন ক্ষণে ক্ষণে মেঘের আকৃতির বদল দেখিতাম, তখন আরো আশ্চর্য্য হইয়া যাইতাম। তোমরা মেঘের আকৃতির এই পরিবর্ত্তন দেখ নাই কি? যে মেঘখানিকে প্রথমে বানরের মত আকারে দেখিলে, একটু পরেই তাহাকে হয় ত তোমরা একটা প্রকাণ্ড বাঘের আকারে দেখিবে এবং শেষে হয় ত মেঘখানিকে দেখিতেই পাইবে না। তখন গরম বাতাসের ধাক্কা পাইয়া তাহার জলকণাগুলি আবার জলের অদৃশ্য বাষ্প হইয়া দাঁড়াইবে। এই-রকম মেঘের খেলা আমরা ছেলেবেলায় অনেক দেখিয়াছি,—আজও দেখি। বড় মজা লাগে।

আকাশের খুব উপরে যে মেঘ হয়, সেগুলি মাটি হইতে প্রায়ই পাঁচ-ছয় মাইল উপরে থাকে। এই-রকম খুব উঁচু মেঘ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আকাশ বেশ পরিষ্কার, হঠাৎ তোমার মাথার উপরে বা আকাশের একটু উপরে এলোমেলো রকমের ছাড়া ছাড়া কয়েকখানি মেঘ দেখা গেল। এইগুলিই সব চেয়ে উঁচু মেঘ,—আকাশের পাঁচ-ছয় মাইল উপরে ইহারা থাকে। এগুলিকে দেখিলে হঠাৎ মনে হয়,
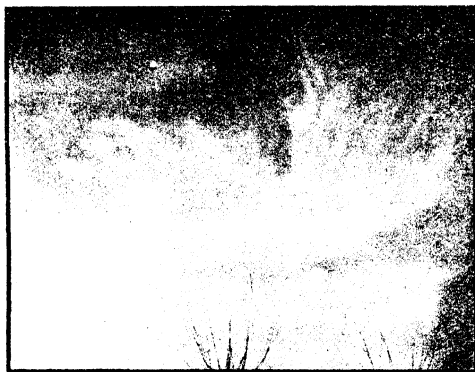
আকাশের খুব উপরের মেঘ।

কতগুলো পাটের বা সূতার গোছা যেন কে আকাশে মেলিয়া শুকাইতে দিয়াছে। সূতা বা পাটের গোছার মতই এগুলিতে আঁশ দেখা যায়; আবার কখনো মনে হয় যেন একটা প্রকাণ্ড পাখীর সাদা পালক আকাশে ভাসিতেছে। তোমরা

"কোদালে-কুড়ুলে" মেঘ দেখ নাই কি ? এগুলিও পাঁচ-ছয় মাইল উপরে থাকে। আকাশের দিকে নজর রাখিলে, তোমরা এই মেঘ প্রায়ই দেখিতে পাইবে। কোদাল

"কোদালে-কুড়ুলে" মেঘ।

দিয়া মাটি খুঁড়িলে মাটিতে যেমন ছাড়া-ছাড়া কোদালের দাগ দেখা যায়, এগুলিকে সেই-রকম খোঁড়া মাটির মত দেখায়। কখনো কখনো এই মেঘ দেখিলে পুকুরের জলের ছোট-ছোট ঢেউয়ের কথাও তোমাদের মনে পড়ে। তখন সত্যই মনে হয় আকাশের খানিকটা জায়গা জুড়িয়া যেন মেঘের ঢেউ চলিতেছে,—সেগুলা ঢেউয়ের মতই ছাড়া-ছাড়া থাকিয়া আকাশের খানিকটা অংশ ঢাকিয়া রাখে। ছেলেবেলায় এই কোদালে-কুড়ুলে মেঘ দেখিলে মনে হইত, যেন কে

কতকগুলি ছোট-ছোট বালিশ আকাশে মেলিয়া শুকাইতেছে। তোমাদেরও এই-রকম মনে হয় না কি?

তোমরা যদি এই-সব পাঁচ-ছয় মাইলের উঁচু মেঘ লক্ষ্য কর, তবে একটা মজা দেখিতে পাইবে। সাধারণ মেঘে ঢাকা পড়িলে চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্র দেখা যায় না। মেঘলা দিনে চাঁদের আলো বা রৌদ্র কিছুই থাকে না। কিন্তু এই মেঘগুলি ভাসিতে ভাসিতে যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাহাদের আলো একটুও কমে না। কেন ইহা হয়, বোধ হয় তোমরা তাহা জানো না। এই-সব মেঘের কণাগুলি জলের আকারে থাকে না। উপরকার আকাশের ঠাণ্ডায় জমিয়া সেগুলি বরফের গুঁড়া হইয়া দাঁড়ায়। পাত্‌লা বরফের টুক্‌রা ঠিক্ কাচের মতই স্বচ্ছ, ইহা তোমরা হয় ত সকলেই দেখিয়াছ। তাই ঐ-সব বরফের গুঁড়ার মেঘ চন্দ্র-সূর্য্য বা নক্ষত্রকে ঢাকিতে পারে না।

কোথাও কিছু নাই—এক-একদিন হঠাৎ চন্দ্র-সূর্য্যের চারিদিকে এক-একটা প্রকাণ্ড গোলাকার বেড় দেখা যায়। মনে হয়, উহাদের চারিদিকে কে একটা রূপার প্রাচীর গাঁথিয়া দিয়াছে। কখনো কখনো এই পাঁচিলের বেড়ে অনেক রকম রঙ্‌ও দেখা যায়। ইহাকে "চন্দ্র-শোভা" ও "সূর্য্য-শোভা" বলে। তোমরা চাঁদ ও সূর্য্যের এই "শোভা" দেখ নাই কি? বরফ-গুঁড়ার মেঘে চন্দ্র-সূর্য্য ঢাকা পড়িলে আকাশে এগুলির উদয় হয়। "কোদালে-কুড়ুলে মেঘ" এবং

চন্দ্র-সূর্য্যের "শোভা" দেখা গেলে, প্রায়ই দুই-এক দিনের মধ্যে ঝড়বৃষ্টি হইয়া থাকে। নৌকার মাঝিরা এজন্য সে-গুলিকে বড় ভয় করে।

গ্রীষ্ম, শরৎ ও শীতকালে এক-রকম খুব সাদা মেঘ পেঁজা তূলার গাদার মত আকাশে উপরে-উপরে সাজানো দেখা যায়। এই মেঘ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দিনের বেলাতে এগুলি যখন আকাশের গায়ে জমে, তখন সেগুলিকে দেখিলে ছোট-বড় গম্বুজের মত বলিয়া বোধ হয়,—আবার কখনো মনে হয়, গোল গোল তূলার গাদাকে কে যেন ঠেলা দিয়া আকাশের উপরে উঠাইতেছে। এই-রকম দুধের মত সাদা মেঘ তোমরা দেখ নাই কি? এই মেঘে যখন সূর্য্যের আলো পড়ে, তখন মনে হয় যেন সোনা-রূপার জরি দিয়া তাহার কিনারাগুলি মোড়া হইয়াছে। সব-রকম মেঘের মধ্যে বাস্তবিকই এইগুলিকেই দেখিতে সুন্দর। ইহাদিগকে "স্তূপ মেঘ" (cumulus) বলা হয়। স্তূপ-মেঘে বরফের কণা থাকে না,—জলের কণা জমিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হয়। দিনের বেলায় তপ্ত মাটি হইতে যে জলের বাষ্প উপরে উঠে তাহাই যখন আকাশের ঠাণ্ডা জায়গায় পৌঁছে, তখনি এই মেঘ জমে। রাত্রিতে মাটি ঠাণ্ডা থাকে বলিয়া জলের বাষ্প উঠে না,—তাই রাত্রিতে প্রায়ই এই মেঘ দেখা যায় না। সমুদ্রের উপরেও এই মেঘ হয় না। জাহাজের মাল্লারা অকূল সমুদ্রের মাঝে যখন এই মেঘ দেখিতে পায়, তখন বুঝে যে জাহাজ ডাঙার

কাছে আসিয়াছে। এই-সকল মেঘ আকাশের এক মাইল দেড়-মাইল উপরে জমা হয়। তাহা হইলে দেখ, এগুলি

স্তূপ-মেঘ।

আমাদের কাছের জিনিস। যদি কোনোগতিকে তোমরা এক-মাইল উপরে উঠিতে পার, তাহা হইলে "স্তূপ-মেঘের" রাজ্যে পৌঁছিতে পারিবে।

বৈশাখ মাসের বিকালে যে ঝড়ের মেঘ উঠে, তাহাও তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই মেঘ দেখিলে মাঝি-মাল্লারা তাহাদের নৌকাগুলিকে দড়াদড়ি দিয়া নদীর কিনারায় বাঁধিয়া ফেলে; পথের লোক তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলে; এমন কি পাখীর ঝাঁক ও গোরুবাছুরের পালও ঝড়বৃষ্টি আসিতেছে বুঝিয়া মাঠ হইতে গ্রামের দিকে ছুট্ দেয়। কাল-বৈশাখীর মেঘকে "স্তূপ-মেঘই" বলা যাইতে পারে। বৈশাখ মাসের বেলা দুটা-তিনটার সময়ে কি ভয়ানক গরম হয়, তাহা তোমরা জানো। তখন মাটি তপ্ত হইয়া ঠিক্ যেন আগুন হইয়া পড়ে। কাজেই জলের বাষ্প বেলা দুটা তিনটার সময়েই আকাশে বেশি উঠে। ইহাই আকাশের ঠাণ্ডা জায়গায় জমাট বাঁধিয়া কাল-বৈশাখীর মেঘ হইয়া দাঁড়ায়। তখন এই মেঘের আকার আর সাদা গম্বুজের মত দেখায় না। কামারের দোকানে লোহা পিটাইবার নেহাই তোমরা দেখ নাই কি? ইহার মাজাটা সরু ও উপরটা থ্যাব্ড়ানো থাকে। এই থ্যাব্ড়ানো জায়গায় গরম লোহা রাখিয়া কামার মিস্ত্রিরা হাতুড়ির ঘা মারে। বৈশাখের ঝড়ের মেঘের চেহারা নেহাইয়ের মত। তোমরা এবারে ঝড় উঠিবার আগে একবার এই মেঘগুলাকে দেখিয়ো। বিলাতের সাধারণ লোকেরা আগে মনে করিত, বিশ্বকর্ম্মা বজ্র গড়াইবার জন্য এই মেঘের নেহাইয়ের উপরে বড় বড় লোহা রাখিয়া হাতুড়ি দিয়া ঘা মারেন। এই হাতুড়ির শব্দই

ঝড়ের মেঘ।

মেঘের ডাক হইয়া আমাদের কাছে আসে। অনেকে আবার বলে, বিধাতাপুরুষ একটা প্রকাণ্ড জাঁতা দিয়া যখন শিল গুঁড়া করেন, তখনি আমরা মেঘের ডাক শুনিতে পাই। বিধাতার জাঁতার শব্দই মেঘের ডাক। মেঘের ডাকের কথা তোমাদিগকে আর এক সময়ে বলিব।

আমাদের দেশে কখনো কখনো যে ভয়ানক ঘূর্ণি-ঝড় হয়, তাহা হয় ত তোমরা কেহ কেহ দেখিয়াছ। কেবল ঝড় নয়, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও থাকে। ইহাতে প্রতি বৎসরে কত দেশের কত ঘরবাড়ী লোকজন নষ্ট হয়, তাহার হিসাবই হয় না। এই রকম ঝড়ের মেঘ তোমরা দেখিয়াছ কি? ইহার রঙ্ কতকটা ধোঁয়াটে রকমের, কিন্তু আকৃতি ঠিক বুঝা যায় না। এই-মেঘই সকলের চেয়ে আমাদের কাছে আসে। কখনো কখনো দুই হাত উপর দিয়াও ইহারা যাওয়া-আসা করে এবং ঝড়ের জোর বেশি হইলে একএক সময়ে এগুলি কুয়াসার মত মাটির উপর দিয়াও ছুটিয়া চলে। ঝড়ের উৎপাতের মধ্যে যখন আকাশ হইতে মেঘ নামিয়া চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলে, তখন লোকের কত বিপদ হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। পথ খুঁজিয়া যে পালানো যাইবে, তখন তাহারো উপায় থাকে না।

গাছের ঘুম

গাছ কথা কহিতে পারে না; এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইতে পারে না; তাহাদের মুখ চোখ কান কিছুই নাই। সুতরাং তাহারা কি-রকমে ঘুমাইবে,—এই কথাই বোধ হয় তোমাদের মনে হইতেছে। কিন্তু গাছে সত্যই ঘুমায়,—তাহাদের পাতা ও ফুলও ঘুমায়।

এক এক জন ঘুমাইবার সময়ে ভয়ানক নাক ডাকায়; আবার কেহ ঘুমের ঘোরে দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করে। আমার একটা বুড়ো পোষা কুকুর ছিল, সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ভেউ-ভেউ করিয়া ডাকিত। গাছেরা নিতান্ত নিরীহ জীব,—ডাল ভাঙিলে, ফুল-পাতা ছিঁড়িলে তাহারা একটি কথাও বলে না। কুড়ুল দিয়া গোড়া কাটিতে আরম্ভ করিলেও, যতক্ষণ পারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। চুপ করিয়া থাকাই তাহাদের স্বভাব। তাই নাক না ডাকাইয়া এবং স্বপ্নে চীৎকার না করিয়া তাহারা চুপ্‌চাপ ঘুমায়। এইজন্যই গাছের ঘুম তোমাদের নজরে পড়ে না। তোমাদের বাগানের সেই বড় তেঁতুল গাছটা যদি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত, তাহা হইলে কি ভয়ানক কাণ্ডই হইত। পাড়ার লোক নাক-ডাকার শব্দে অস্থির হইয়া পড়িত।

একটা লোক যদি বাহাত্তর বৎসর বাঁচে, তবে তাহার মধ্যে চব্বিশ বৎসর সে ঘুমাইয়া কাটায়। তোমার বয়স কত

জানি না,—হয় ত বারো বৎসর—তাহা হইলে তুমি চার পাঁচ বৎসর ঘুমাইয়া কাটাইয়াছ। তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, এত সময় ঘুমাইয়া নষ্ট করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রয়োজন আছে। আমরা দিনের বেলায় চলিয়া ফিরিয়া হাত-পা নাড়িয়া যে কাজকর্ম্ম করি, তাহাতে আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। এমন কি জাগিয়া থাকিয়া যদি গল্পের বই পড়ি বা কোনোরকম চিন্তা করি, তাহাতেও আমাদের মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই ক্ষয় ও ক্লান্তি নষ্ট করিবার জন্যই ঘুমের ব্যবস্থা আছে। আমরা যখন ঘুমাই তখনি আমাদের দেহে নূতন রক্ত এবং নূতন মাংস উৎপন্ন হয়। ছোট ছেলেরা কত শীঘ্র বড় হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? তাহারা যেমন খায়, তেমনি ঘুমায় এবং তেমনি বড় হয়। প্রতিদিন ষোল ঘণ্টার কম তাহারা ঘুমায় না। সমস্ত দিন ছুটাছুটি ও খেলা করিয়া তাহাদের শরীরের যেমন ক্ষয় হয় তেমনি বেশি ঘুমায় বলিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া তাহারা বাড়িতে পারে। গাছেরা মাটি হইতে রস শুষিয়া খায় এবং পাতা মেলিয়া সূর্য্যের তাপ ও আলো টানিয়া লয় এবং ফুলগুলিকে ফুটাইয়া প্রজাপতি ও মৌমাছিদের ডাকে এবং তাহাদিগকে মধু খাওয়ায়। এই-রকমে প্রতিদিনই দিবারাত্রি তাহাদিগকে অনেক কাজ করিতে হয়। ইহাতে গাছপালার শরীরের ক্ষয় এবং ক্লান্তি হয় না কি? কাজেই একটু না ঘুমাইলে গাছেরাও বাঁচে না। খুব খাটিয়া খুটিয়া

ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িলে আমাদের চোখ দুটা আপনিই আঁটিয়া আসে,—আমরা তখন ঘুমাইয়া পড়ি। গাছেদের অবস্থা তাহাই হয়,—ক্লান্ত হইলে কোনোরকম চেষ্টা না করিয়াই তাহারা ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রাণীদের মধ্যে অনেকে অনেক-রকমে ঘুমায়। মানুষ সাধারণতঃ দিনে কাজকর্ম্ম করিয়া রাত্রিতে ঘুমায়। আবার যা'রা রাত্রিতে রেলে কাজ করে বা পাহারা দেয়, তাহাদের কেহ কেহ দিনেই ঘুমায়। দিনের বেলায় পোকা-মাকড় ধরিয়া না খাইলে পাখীদের ক্ষুধা ভাঙে না। তাই ইহারা দিনে চলা-ফেরা করিয়া আমাদেরি মত রাত্রিতে ঘুমায়। যে-সব প্রাণী রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া চোরের মত পরের অনিষ্ট করে, তাহারা দিনে ঘুমাইয়া রাত্রি জাগে। ছাগল, ভেড়া, কুকুর-ছানা ধরিয়া খাইবার জন্য বাঘ ও শেয়ালের দল দিনে ঘুমাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়। আবার এ-রকম প্রাণীও অনেক আছে, যাহারা দুই তিন মাস দিবারাত্রি ঘুমাইয়া বৎসরের বাকি কয়েকটা মাস কেবল জাগিয়াই কাটায়। তোমরা এ-রকম প্রাণী দেখ নাই কি? সাপ ও ব্যাঙেরা এই-রকমেই শীতকালটা ঘুমাইয়া কাটায়। তা'ছাড়া মৌমাছি বোল্‌তা ভীমরুল প্রভৃতি অনেক পোকা-মাকড়ও খুব শীতের সময়টা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দেয়।

যাহা হউক, তোমরা যত রকম ঘুমের কথা শুনিলে, তাহার সব রকমের ঘুমই গাছপালার মধ্যে দেখা যায়।

যে-সব গাছ, সাপ ও ব্যাঙের মত তিন মাস ধরিয়া ঘুমায় আমরা প্রথমে তাহাদেরি কথা তোমাদিগকে বলিব। আদা হলুদ ওল্ কচু রজনীগন্ধা প্রভৃতির গাছ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল এবং শরৎ কালে রৌদ্র পাইয়া এই গাছগুলি খুব বাড়িয়া উঠে। গাদা গাদা কেঁচো ও পোকা খাইয়া ব্যাঙ্ যেমন মোটা হয়, এই সব গাছের পাতা ও মূল সেই-রকমে বড় হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে শীতকাল আসিলেই এই গাছগুলি ব্যাঙের মত ঘুমাইতে আরম্ভ করে। তখন তাহাদের পাতা ও ডাল শুকাইয়া যায়। আমরা মনে করি বুঝি গাছগুলি মরিয়া গেল। কিন্তু তাহারা মরে না। ব্যাঙ যেমন মাটির তলায় বা পুকুরের জলে মড়ার মত পড়িয়া থাকে, ইহারাও পাতা ও ডালের সারবস্তু শিকড়ে চালান দিয়া, শীতকালে চুপ করিয়া ঘুমায়। তখন ইহাদের গোড়ায় কলসী কলসী জল ঢালিলেও সেই ঘুম ভাঙে না। তার পরে গ্রীষ্মকালের বৃষ্টির জল গোড়ায় পৌঁছিলেই তাহারা জাগিয়া উঠে। সমস্ত রাত্রি ঘুমাইয়া প্রাতঃকালে যখন আমরা জাগিয়া উঠি,তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না,—আমরা হয় ত তাড়াতাড়ি একটু বেড়াইয়া আসিয়া পড়িতে বসি। ঘুম-ভাঙার পরে ঐ-সব গাছও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা মড়ার মত মাটির তলায় লুকাইয়া ছিল, তাহারাই তখন নূতন পাতা ছাড়িয়া প্রকাণ্ড গাছ হইয়া দাঁড়ায়।

শীতের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিলে আমড়া জিউলি শিমুল গোলকচাঁপা বাদাম প্রভৃতি গাছের পাতা ঝরিতে সুরু করে। তখন একটিও নূতন পাতা গজায় না,—দেখিলে মনে হয় যেন গাছগুলি মরিয়া গিয়াছে। ইহাও গাছদের আর এক-রকমের ঘুম। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে শামুকে কি-রকম উৎপাত করে, তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। দিনরাত্রি ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে বেড়াইয়া গাছের পাতার ইহারা সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু শীতকালে শামুক দেখা যায় না। তখন সমস্ত দেহটা খোলার মধ্যে পূরিয়া খোলার মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তার পরে অকাতরে ঘুম সুরু করে। আমড়া শিমুল প্রভৃতি গাছের ঘুম শামুকেরই ঘুমের মত। শীতকাল আসিলেই পাতার সার বস্তু ইহারা গায়ের ছালে জমা করে। তার পরে ঠাণ্ডার ভয়ে শামুকেরা যেমন খোলার মুখ বন্ধ করে, ইহারাও একটা কঠিন শুক্‌না ছালে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলে এবং শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এই-রকম ঘুমন্ত গাছের ছাল তোমরা ছুরি দিয়া একটু কাটিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, কর্ক বা সোলার মত একটা পুরু আবরণ ইহাদিগকে সত্যই রক্ষা করিতেছে।

আমরা সাধারণতঃ দিনে জাগিয়া রাতে ঘুমাই। এই-রকম দিনে-জাগা রাতে-ঘুমানো গাছ যে কত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। আমলকী শিরিষ তেঁতুল কৃষ্ণচূড়া বকফুল প্রভৃতি ছোট পাত্‌লা পাতাযুক্ত অনেক গাছই সমস্ত দিন

রোদে পুড়িয়া মাটির রস খাইয়া সন্ধ্যার সময়ে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ঘুম সুরু করে।

লজ্জাবতী যে কেবল লাজুক তাহা নয়, ছোট খোকাদের মত সে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমাইয়াও পড়ে। জুজুর ভয় দেখাইলে আমাদের ছোট খোকাটি যেমন চোখ বুঁজিয়া চুপ করিয়া থাকে, ইহারাও সেই-রকম ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।
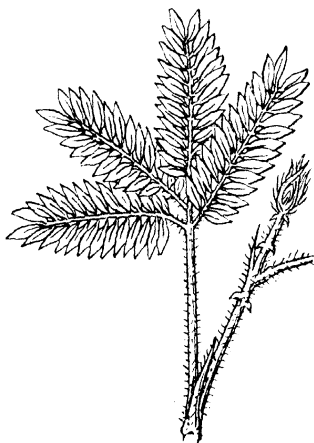
জাগ্রত লজ্জাবতী।

তোমরা ঐ-সব গাছের ঘুম দেখ নাই কি? তোমাদের কৃষ্ণচূড়া বা তেঁতুল গাছ থাকিলে সন্ধ্যার সময় এই গাছগুলিকে লক্ষ্য করিয়ো; দেখিবে, তাহাদের ছোট পাতাগুলি দুই-দুইটি করিয়া জোড় বাঁধিয়া গিয়াছে। সমস্ত রাত্রি পাতাগুলি এই-রকম জোড়া থাকে এবং ভোরে রৌদ্র উঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলিয়া যায়। তেঁতুল আমলকী কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি গাছ এই-রকমেই ঘুমায়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এ কি-রকম ঘুম ? শীত-কালে তোমাদের পোষা কুকুরটি কি-রকমে ঘুমায় একবার মনে করিয়া দেখ। সে তাহার লেজ গুটাইয়া এবং পা কয়েকখানিকে বুকের মধ্যে গুঁজিয়া একটা গোলাকার জিনিস হইয়া ঘুমায় না কি ? শরীরের গরম বাহির হইয়া গেলে সকলেরই শীত লাগে। তাই আমরা শীতকালে শাল জামা গায়ে জড়াইয়া তাপ বাহির হইতে দিই না। কুকুর বিড়ালরা গায়ে জামা দেয় না, তাই কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমায়, ইহাতে গায়ের গরম গায়েই থাকে। গাছপালারা আবার কুকুর বিড়ালের চেয়েও অধম,—তাহাদের হাত নাই, পা নাই, লেজও নাই। তাই পাতাগুলিকে গুটাইয়া তাহারা শরীরের তাপ রক্ষা করে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, গাছেদের আবার গরমের দরকার কি ? দরকার খুবই আছে। দিনের বেলায় সূর্য্যের যে তাপ
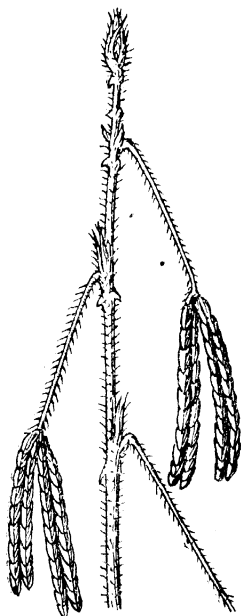
ঘুমন্ত লজ্জাবতী।

তাহারা পাতা দিয়া শুষিয়া শরীরে জমা করে, তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে গাছেরা খাদ্য হজম করিতে পারে না। তাই ঐ-সব গাছ পাতা গুটাইয়া শরীরের তাপ রক্ষা করে এবং তার পরে ঘুমায়।

ফুলের ঘুম তোমরা দেখ নাই কি ? জবা পদ্ম স্থলপদ্ম লাউ কুমড়া প্রভৃতি ফুল দিনে জাগিয়া রাত্রিতে ঘুমায়। তোমরা সমস্ত পদ্মপুকুর খুঁজিয়াও রাত্রিতে একটিও ফোটা পদ্মফুল পাইবে না। আবার রজনীগন্ধা কুমুদ মল্লিকা যুঁই চামেলি সন্ধ্যামালতি প্রভৃতি রকম-রকম ফুল দিনে ঘুমাইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াই কাটায়। এই জন্য দিনের বেলায় সমস্ত বাগান খুঁজিয়াও তোমরা টাট্‌কা যুঁই বা চামেলির সন্ধান পাইবে না।

তোমরা বই কিনিবার জন্য কোনো বড় বইয়ের দোকানে গিয়াছ কি ? দোকানের বাহিরে সাইনবোর্ডে কত ভালো ভালো বইয়ের নাম লেখা থাকে। পথের লোক তাহা পড়িয়া দোকানে যায় এবং বই কেনে; সমস্ত দিনই বেচা-কেনা চলে। দোকানদার বই জোগাইতে এবং টাকা গুণিয়া লইতেই ব্যস্ত থাকে,—একটুও বিশ্রামের সময় পায় না। তার পর যখন রাত্রি হয়, তখন আর কেহই বই কিনিতে আসে না। এই সময়ে দোকানদার সাইনবোর্ড ঘরে তুলিয়া দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। ঠিক এই-রকমের দোকানদারী করিবার জন্যই রঙিন্ পাপ্‌ড়ি মেলিয়া

লাউ-কুম্‌ড়োর ফুল, জবাফুল এবং আরো কত রঙিন্ ফুল দিনে ফুটিয়া উঠে। শরৎকালের ভোরবেলায় তোমরা যদি পদ্মবনের ধারে গিয়া দাঁড়াইতে পার, তবে দেখিবে, পদ্মবনে যেন ভ্রমর মৌমাছি ও প্রজাপতিদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। মধু খাইবার জন্য এক ফুল হইতে আর এক ফুলে তাহাদের কত লাফালাফি এবং দৌড়াদৌড়িই চলে। দোকানদার দোকান সাজাইয়া সাইন্‌বোর্ড টাঙাইয়া যেমন খরিদ্দার জোগাড় করে, ফুলেরা রঙিন্ পাপ্‌ড়ি মেলিয়া মধুকোষে মধু জমা রাখিয়া এবং সুন্দর গন্ধ ছড়াইয়া ঠিক্ সেই-রকমেই প্রজাপতি ও ভ্রমরদের ডাকে। খরিদ্দার দোকানে আসিয়া জিনিস-পত্র কেনে এবং টাকা দেয়। ভ্রমর মৌমাছির দল ফুলেদের টাকা দেয় না বটে, কিন্তু মধু খাইবার সময়ে এমন একটি উপকার করে যে তাহার দাম টাকার চেয়েও অনেক বেশি।

এই উপকারটি যে কি, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। কেবল ফুটিয়া উঠিলেই সব ফুলে ফল হয় না। ফুলের রেণু যদি ফুলের মাঝখানের কেশরে গিয়া না ঠেকে, তবে সে-ফুলে ফল ধরে না। আবার এমনও অনেক ফুল আছে, যাহার এক ফুলের রেণু আর একটি ফুলের কেশরে না পড়িলে, ফুল নষ্ট হইয়া যায়—তাহাতে ফল হয় না। এখন বোধ বুঝিতে পারিতেছ,—যে-সকল প্রজাপতি ও মৌমাছি মধুর লোভে ও রঙের বাহারে এক ফুল হইতে অন্য ফুলে

আনাগোনা করে, তাহারাই ফুলের রেণু গায়ে-মাথায় মাখিয়া এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বহিয়া লইয়া যায়। ইহাতেই ফুল হইতে ফল হয়। প্রজাপতি প্রভৃতি ফুলেদের এই যে উপকারটি করে, তাহা কি কম উপকার? এই উপকার পাইবার জন্যই সমস্ত দিন পাপ্‌ড়ি মেলিয়া ও রোদে পুড়িয়া ফুলগুলি হাঁ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া থাকে। তার পরে যখন সন্ধ্যার সময়ে প্রজাপতির দল এবং মৌমাছির ঝাঁক বাসায় চলিয়া যায়, তখন পাকা দোকানদারের মত ফুলেরা পাপ্‌ড়ি গুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। ফুলগুলিকে তোমরা বোধ হয় খুব ভালো-মানুষ ভাবো,—কিন্তু তাহা নয়, ইহারা পাকা ব্যবসাদার।

যে-সব দোকানে রাত্রিতে কেনা-বেচা বেশি চলে, সেখানে দোকানদারদের বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। দিনে ঘুমাইয়া তাহারা রাত্রিতেই দোকান খোলে এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কেনা-বেচা করে। ফুলেদের মধ্যে এই-রকম দোকানদার অনেক আছে। রজনীগন্ধা মল্লিকা শিউলি সন্ধ্যামালতি সকলি এই দলের ফুল। প্রজাপতিরা ইহাদের রেণু বহিয়া লইয়া যাইতে পারে না। রাত্রিতে যে-সব পোকা উড়িয়া তোমাদের প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই রাত্রিতে এই সকল ফুলের রেণু এক ফুল হইতে অন্য এক ফুলে বহিয়া লইয়া যায়। কাজেই দিনে ঘুমাইয়া এই সব ফুলকে রাত্রি জাগিতে হয়। রাত্রিতে যে-সকল

দোকানের কাজ চলে, তাহাতে সাইন্‌বোর্ড টাঙাইবার দরকার হয় না; কারণ সাইন্‌বোর্ডের রঙ্‌চঙ্‌ রাত্রির অন্ধকারে লোকে দেখিতে পায় না। ফুলের রঙ্‌ও রাত্রির অন্ধকারে প্রজাপতির নজরে পড়ে না। এই জন্যই রাত্রির ফুলে প্রায়ই বেশি রঙ্‌চঙ্‌ দেখিতে পাওয়া যায় না। এগুলির রঙ্‌ প্রায়ই সাদা হয়। এই সাদা রঙ্‌ দেখিয়া এবং সমস্ত রাত্রি ফুল হইতে যে গন্ধ বাহির হয়, তাহা শুঁকিয়াই প্রজাপতিরা ফুলে আসিয়া বসে। তার পরে ভোর বেলায় যেমনি তাহারা বাসায় ফিরিয়া যায়, তেমনি পাপ্‌ড়ি বুজিয়া ফুলেরা ঘুমাইতে সুরু করে, অথবা ঝরিয়া মাটিতে পড়ে।

রক্ত

হাতে ছুরির খোঁচা লাগিলে বা পায়ে কাঁটা ফুটিলে আমাদের শরীর হইতে রক্ত বাহির হয়। শরীরের সব জায়গাতেই রক্ত থাকে। ইহা শরীরে থাকিয়া কি কাজ করে, সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব।

নদীর জলে কি-রকম স্রোত, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহা কখনই পুকুরের জলের মত স্থির থাকে না। বর্ষাকালে নর্দ্দামা দিয়া যেমন বৃষ্টির জল চলে, নদীর জল ঠিক সেই-রকমেই চলিয়া সমুদ্রে পড়ে। আমাদের শরীরের ভিতরে যে রক্ত আছে, তাহা নদীর জলের মত চঞ্চল। কিন্তু নদীর জল যেমন সমুদ্রে গিয়া দাঁড়ায়, আমাদের শরীরের রক্তের স্রোত সে-রকম কোনো জায়গায় গিয়া থামে না; ইহা শরীরের ভিতরে বারবার কেবল ঘুরিয়াই বেড়ায়।

যে-সব সহরে জলের কল আছে, সেখানে লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে কি-রকমে জল আসে তোমরা দেখ নাই কি? ফিল্‌টার-করা জল সহরের কোনো একটা জায়গায় জমা থাকে এবং সেই জলের সঙ্গে নল জোড়া থাকে। তার পরে পম্প্ চালাইয়া জলের উপরে চাপ দিলে সেই-সব নলের ভিতর দিয়া জল লোকের বাড়ী উপস্থিত হয়। রক্তও ঠিক এই-রকমেই আমাদের শরীরের ভিতরকার সব জায়গায় চলাফেরা করে।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ,—জলের কলে যে পম্প্ আছে এবং নল আছে, রক্ত চলাচলের জন্য শরীরে বুঝি তাহা নাই। কিন্তু প্রাণিমাত্রেরই শরীরের ভিতরে সত্যই পম্প্ আছে এবং নলও আছে। আমাদের শরীরের ভিতরে যে শিরা ও উপশিরা আছে, তাহা নলের মতই ফাঁপা জিনিস। এইগুলির ভিতর দিয়া রক্ত নর্দ্দামার জলের মত শরীরের সব জায়গায় চলাচল করে। তোমরা ফুট্‌বল্ খেলার সময়ে অনেক ক্ষণ দৌড়িয়া যখন হাঁপাইয়া পড়, তখন বুকের বাম দিকে একবার হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, বুকের একটা জায়গা যেন তুর্-তুর্ করিয়া কাঁপিতেছে। শরীরের এই জায়গাতেই রক্ত চালাইবার পম্প্ আছে। ইহাকে হৃদ্‌পিণ্ড বলে। সমস্ত বড় বড় প্রাণীর দেহেই এই যন্ত্র আছে। জন্মের সময় হইতে মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত, উহা ঐ-রকমে দপ্ দপ্ করিয়া পম্পের মত শরীরের সব জায়গায় রক্ত চালায়। যখন তোমরা ঘুমাইয়া থাক, তখনো উহা চলে। যদি আধ মিনিটের জন্যও এই পম্পের কাজ বন্ধ থাকে, তবে প্রাণীরা মারা যায়। কিন্তু সব সময়ে ইহা সমান জোরে চলে না। যখন তোমরা ছুটাছুটি ও লাফালাফি কর, তখন উহার কাজ খুব তাড়াতাড়ি চলে। তাই তখন বুকে হাত দিয়া দেখিলে, উহার ধড়্‌ফড়ানি ভালো করিয়া বুঝা যায়। যখন তোমরা কোনো কারণে হঠাৎ রাগিয়া উঠ বা ভয় পাও, তখনো হৃদ্‌পিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে।

সহজ অবস্থায় মিনিটে কতবার হৃদ্‌পিণ্ড টিপ্‌-টিপ্‌ করে, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। ঘড়ির সঙ্গে মিলাইয়া বুকে হাত দিয়া একবার ইহার কাঁপুনি পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, প্রতি মিনিটে প্রায় আশী বার বুক টিপ্‌-টিপ্‌ করিতেছে। বুড়ো মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড খুব ধীরে ধীরে কাঁপে। আবার খুব ছোট খোকাদের হৃদ্‌পিণ্ড মিনিটে একশত কুড়ি হইতে একশত চল্লিশবার পর্য্যন্ত কাঁপিতে দেখা যায়,—সে কাঁপুনি গোণাই যায় না। অসুখের সময়ে ডাক্তার আসিয়া যখন তোমার নাড়ী দেখেন, তখন হৃদ্‌পিণ্ডের কাঁপুনি কি-রকমে চলিতেছে, তাহাই পরীক্ষা করেন। জ্বর হইলে ছেলে-বুড়ো সকলেরি হৃদ্‌পিণ্ড খুব তাড়াতাড়ি টিপ্‌-টিপ্‌ করে।

আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রগুলা কি-রকম, তোমরা বোধ হয় এখন তাহাই জানিতে চাহিতেছ। আকারে উহা খুব বড় নয়। মুঠা বাঁধিলে তোমার হাতখানা যে-রকম দেখায়, তোমার হৃদ্‌যন্ত্র ঠিক্‌ সেই-রকম বড়। আমার হৃদ্‌যন্ত্র ঠিক্‌ আমারি হাতের মুঠার মত ; খুব ছোট ছেলের হৃদ্‌যন্ত্র তাহারা মুঠা বাঁধিলে যতটুকু দেখায়, ঠিক্‌ ততটুকু।

তোমাদের পড়ার ঘরের মাঝে যদি একটা দেওয়াল খাড়া করা যায়, তবে একটা ঘর দুটা হইয়া দাঁড়ায়। তার পরে এই ছোট ঘর দুটির প্রত্যেকের মাঝে যদি এক-একটা দেওয়াল দাও, তবে সেই দুটা ঘর চারিটা হইয়া পড়ে। আমাদের হৃদ্‌যন্ত্র হাতের মুঠির মত একটা ছোট জিনিস হইলেও,

উহার মধ্যে ঐ-রকম চারিটা ছোট কুঠারি আছে। শরীরের সব জায়গায় ঘুরিয়া রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের উপরকার দুইটা কুঠারিতে আসিয়া জমা হয় এবং তার পরে নীচেকার কুঠারিতে পৌঁছিলে তাহাই শিরার ভিতর দিয়া পিচ্‌কারির জলের মত সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। একটা ফুট্‌বলের ব্লাডারের ভিতরে জল রাখিয়া তোমরা যদি তাহাতে জোরে চাপ দিতে থাক, তবে ভিতরকার জলের অবস্থা কি হয়, একবার ভাবিয়া দেখ। ভিতরকার জল তখন ব্লাডারের মুখের সেই সরু নলটি দিয়া পিচ্‌কারির ধারার মত বাহির হইয়া পড়ে না কি? হৃদ্‌যন্ত্রের কুঠারির ভিতরকার রক্ত শিরার ভিতর দিয়া ঠিক্ এই-রকমেই চলে। হৃদ্‌যন্ত্র আপনা আপনিই সর্ব্বদা তালে তালে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়,—কাজেই চাপ পাইয়া রক্তের স্রোত তালে তালে শিরার ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলে।
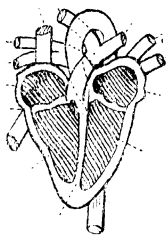
হৃদ্‌পিণ্ডের চারিটা কুঠারি।

তোমাদের শরীরে কতখানি রক্ত আছে বলিতে পার কি? বোধ হয় পার না। বৈজ্ঞানিকেরা তাহার একটা হিসাব করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের ওজন যত, তাহার ত্রিশ ভাগের এক ভাগ রক্ত শরীরে থাকে। তোমার ওজন কত জানি না। যদি ত্রিশ সের হয়,—তবে

তোমার শরীরে নিশ্চয়ই এক সের রক্ত আছে। এই রক্ত-টুকুই হৃদ্‌পিণ্ডের চাপে সর্ব্বাঙ্গের শিরার ভিতর দিয়া চলিয়া আবার হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে এবং সেখানে নূতন চাপ পাইয়া ছুটিয়া বাহির হয়। এই-রকমে শরীরের রক্ত এক মিনিটের জন্যও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পায় না। এক ঝলক রক্ত হৃদ্‌পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া কতক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিয়া আসে, তাহারও হিসাব করা হইয়াছে। তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, অন্ততঃ দশ পনেরো মিনিটের কমে তাহা সকল শরীর ঘুরিয়া আসিতে পারে না। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়। আধ মিনিটের মধ্যে সমস্ত শিরা-উপশিরা ঘুরিরা রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে আসিয়া জমা হয়। রক্ত কত জোরে শরীরের ভিতর দিয়া চলে, একবার ভাবিয়া দেখ।

কূয়োতে পম্প্‌ লাগাইয়া আমরা যখন জল উপরে তুলি, তখন প্রায়ই তাহার কল বিগড়াইয়া যায়,—মিস্ত্রি ডাকিয়া তখন কত কষ্টে কল মেরামত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু আমাদের বুকের ভিতরকার হৃদ্‌যন্ত্র জন্মের সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত দিনরাত শরীরের রক্ত চালাইয়াও প্রায় বিগড়ায় না। ইহা আশ্চর্য্যের কথা নয় কি? ইহা ছাড়া এই ছোট যন্ত্রটি শরীরের ভিতরে থাকিয়া প্রতিদিন যে-কাজ করে তাহার কথা শুনিলে তোমরা আরো আশ্চর্য্য হইবে। মনে কর, আমাদের হৃদ্‌যন্ত্রের মত একটা পম্প্‌ কূয়োতে লাগাইয়া আমরা জল উঠাইতেছি। ইহাতে কূয়োর কতটা জল উপরে উঠিবে,

তোমরা আন্দাজ করিতে পার কি? বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, এই-রকম পম্প্ চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া চলিলে কূয়ো হইতে প্রায় সাত শত মণ জল তোলা যাইতে পারে। মানুষ প্রায়ই ষাট্ সত্তর বৎসর বাঁচে, কেহ কেহ আবার আশী নব্বই বৎসরও বাঁচে। শরীরের ঐ ছোট যন্ত্রটি কত কাজ করে একবার চিন্তা করিয়া দেখ। মানুষের হাতে-তৈয়ারি কোনো কলই এ-রকম কাজ করিতে পারে কি?

রক্তের রঙ্ লাল দেখাইলেও ইহার আগাগোড়া সবই কিন্তু লাল নয়। খড়ি মাটি মিশাইলে জল সাদা দেখায়। কিন্তু সেই জলকে যখন সরু ন্যাকৃড়া বা ব্লটিং কাগজ দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া যায়, তখন আর তাহা সাদা থাকে না। খড়ি মাটির গুঁড়া মিশানো থাকে বলিয়াই যেমন জলকে সাদা দেখায় তেমনি রক্তে কতকগুলি লাল রঙের কণা ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়াই রক্তকে লাল দেখায়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, একটু রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলেই বুঝি ঐ লাল কণাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু কখনই এ-রকমে দেখা যায় না,—অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা না করিলে সেগুলি নজরেই পড়ে না। এক-একটি মানুষের রক্তে সর্ব্ব-শুদ্ধ পঁচিশ-লক্ষ কোটি লাল কণা থাকে। মাছ যেমন নদীর জলে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, এই লাল কণাগুলি সেই-রকমেই শিরার ভিতরকার রক্তের স্রোতে ভাসিয়া চলে।

রক্তের এই লাল কণাগুলি আমাদের শরীরের যে

উপকার করে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। আমাদের নদীগুলিতে যে-সব নৌকা ও ষ্টীমার দিবারাত্রি যাতায়াত করে, সে-গুলিতে ধান চাল পাট গম প্রভৃতি কত জিনিসই বোঝাই থাকে। নৌকা ষ্টীমার প্রভৃতির এই ধান চাল কিনিয়া লইয়া আমরা সংসার চালাই। রক্তের লাল কণাগুলি ঠিক্ নৌকার মতই অক্সিজেন বোঝাই লইয়া রক্তের ভিতর দিয়া চলিয়া বেড়ায় এবং শরীরের যেখানে অক্সিজেনের দরকার সেখানে তাহা দিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে ফিরিয়া আসে। মাল-বোঝাই নৌকা কোনো বন্দরে মাল নামাইয়া কখনই খালি অবস্থায় ফেরত আসে না,—পথের মাঝে যেখানে যে নূতন মাল পাওয়া যায় তাহা বোঝাই লইয়া ফিরিতে থাকে। রক্তের লাল কণাগুলি ঠিক তাহাই করে। শরীরের যে জায়গা দুর্ব্বল এবং পীড়িত, লালকণাগুলি সেখানে অক্সিজেন্ ঢালিয়া দেয় এবং সেই পীড়িত জায়গায় যে খারাপ বাষ্প বা দূষিত জিনিস জমা থাকে তাহা বোঝাই লইয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে ছাড়িয়া দেয়।

মানুষের রক্তের লালকণা

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য এবং শরীরের আবর্জ্জনা নষ্ট করিবার জন্য আমাদের রক্তে লালকণা আছে। যাহাদের শরীরে লালকণা কম, তাহারা কখনই সুস্থ থাকে না।

অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে এই-সব লাল-কণার

মধ্যে এক-রকম সাদা-কণাও দেখা যায়। কিন্তু এগুলি কখনই রক্তে বেশি সংখ্যায় থাকে না। শরীরে যতগুলি লাল-কণা থাকে, তাহার সাত শত ভাগের এক ভাগ মাত্র সাদা-কণা দেখা যায়। এগুলি শরীরের মধ্যে থাকিয়া যে কাজ করে, তাহাও অদ্ভুত। বড় বড় সহরে ওভারসিয়ার সাহেব কতকগুলি কুলি-মজুর সঙ্গে লইয়া সহরের রাস্তা-ঘাট তদারক করিতে বাহির হন। রাস্তার ইট্ উঠিয়া গেলে বা নর্দ্দামায় জল জমিতে থাকিলে, ওভারসিয়ার সাহেবের হুকুমে কুলিরা রাস্তা-ঘাট মেরামতে লাগিয়া যায়। ইহা তোমরা দেখ নাই কি ? রক্তের সাদাকণাগুলি ঠিক্ কুলি-মজুরেরই কাজ করে। রক্তের সঙ্গে চলিতে চলিতে শরীরের যেখানে মেরামত করার মত জায়গা দেখিতে পায়, সেখানে তাহারা থামিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মেরামত সুরু করে।

ইহা ছাড়া রক্তের সাদা-কণার আরো একটা বড় কাজ আছে। তোমরা বোধ হয় জানো, আমাদের চারিদিকের বাতাসে এবং মাটিতে নানা রকম ব্যারামের বীজ দিবারাত্রি ভাসিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে জীবাণু বলা হয়। খাবারের সঙ্গে বা অন্য কোনো রকমে এগুলি শরীরে প্রবেশ করিলেই সর্ব্বনাশ হয়,—তখন আমরা ব্যারামে পড়ি। কলেরা হাম বসন্ত প্লেগ যক্ষা ধনুষ্টঙ্কার ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরবিকার প্রভৃতি অনেক রোগই এই সব জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া উৎপন্ন করে। রক্তের সাদাকণাগুলি যখন রক্তের মধ্যে এই-সব

জীবাণু দেখিতে পায়, তখন বাঘের মত লাফাইয়া সেগুলিকে চাপিয়া ধরিয়া নষ্ট করে। ভাবিয়া দেখ আমাদের শিরার ভিতরকার রক্তস্রোতে সর্ব্বদা কি ভয়ানক মারামারিই চলিতেছে। যদি শরীরে বল থাকে এবং রক্ত তাজা থাকে, তাহা হইলে সাদাকণাগুলি সকল জীবাণুকে নষ্ট করিয়া জয়ী হয়। কিন্তু দুর্ব্বল শরীরের দুর্ব্বল সাদা-কণা রক্তের জীবাণুকে মারিতে পারে না। তখন জীবাণুরা জয়ী হইয়া আমাদের শরীরে ব্যাধির সৃষ্টি করে।

শরীরের কোনো জায়গায় আঘাত লাগিলে বা ঘা হইলে কি হয়, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই জানো,—সে জায়গাটা ফুলিয়া উঠে ও লাল হইয়া দাঁড়ায়। আমরা ভাবি ফুলিয়া উঠা ও লাল হওয়াই বুঝি রোগ। কিন্তু তাহা নয়। আঘাতের জায়গাটা মেরামত করিবার জন্য গায়ের রক্ত সাদা কণাগুলিকে সেখানে জমা করে এবং সেগুলি খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘা মেরামত করিতে করিতে সেখানকার জীবাণুদের সঙ্গে ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেয়। ইহাতেই জায়গাটা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠে।

রক্ত জিনিসটা যে আমাদের শরীরের কত উপকারী তাহা এখন ভাবিয়া দেখ। তাই অসুখ হইলে ডাক্তার রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেন এবং সাদা ও লাল-কণাগুলি তাহাতে ঠিক পরিমাণে আছে কিনা তাহা স্থির করেন।

ব্যাঙাচি

তোমরা পুকুর খাল বা বিলের জলে নিশ্চয়ই ব্যাঙাচি দেখিয়াছ। কালো কালো ব্যাঙাচিরা কিছু দিন জলের ভিতরে নড়িয়া-চড়িয়া খেলা করে, তার পরে তাহারা ছোট ব্যাঙ হইয়া ডাঙায় উঠে। আজ তোমাদিগকে এই ব্যাঙাচি-দেরই সম্বন্ধে কিছু বলিব।
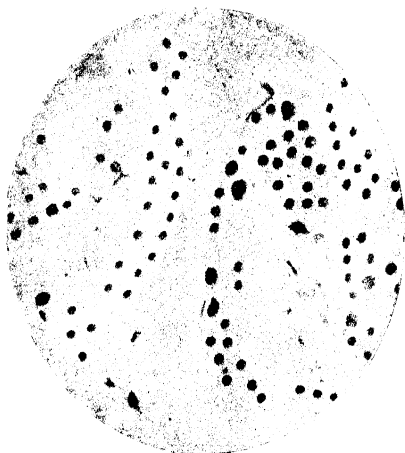
ব্যাঙের ছড়া-গাঁথা ডিম।

ছোট ছোট ডিম হইতে ব্যাঙাচি বাহির হয়। এই ডিম-গুলি কিন্তু হাঁস বা পায়রার ডিমের মত সাদা এবং বড় নয়।

জিউলির আঠার মত এক-রকম জিনিসের মধ্যে তিলের মত কালো কালো অনেক ডিম কিছু দিন পুকুরের জলে ভাসিয়া বেড়ায়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, কালো ছিঁটে-ফোঁটা-দেওয়া একগাছা দড়ি যেন জলে ভাসিতেছে। ইহাই ব্যাঙের ডিম। এবারে তোমরা পুকুরের বা ডোবার জলে যখন এই-রকম মালার মত জিনিস ভাসিতে দেখিবে, তখন তাহা পরীক্ষা করিয়ো।

নিজের বাচ্চাদের জন্য জীবজন্তুরা কত কষ্টই করে। বাছুর হইলে গোরুগুলো ত পাগলের মতই হইয়া যায়। তখন যাহাকে দেখে তাহারা শিং ঘুরাইয়া মারিতে যায়। তাহারা ভাবে পৃথিবীর সব লোকই বুঝি বাছুরগুলিকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছে। পাখীরা ডিম পাড়িলে কি-রকম ভয়ে-ভয়ে থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? একটা কুকুর বা বিড়াল বাসার কাছ দিয়া চলিয়া গেলে "ক্যাঁ-ক্যাঁ" করিয়া তাহার মাথায় ঠোকর মারে। পাখীরা তখন ভাবে, কুকুরটা বুঝি তাহাদের ডিম খাইবার জন্যই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু ব্যাঙের মা'দের এ-সব ভাবনা চিন্তা নাই। ডিমগুলি পুকুরের জলে ছাড়িয়া দিয়াই তাহারা নিশ্চিন্ত হয়। সেগুলি ঝড়-বৃষ্টিতে নষ্ট হইল, কি মাছে খাইয়া ফেলিল তাহার একটুও খোঁজ লয় না।

ডিম পাড়িয়া পাখীরা তাহার উপরে বসিয়া তা দেয়। পাখীদের গা খুব গরম। গায়ের গরমে ডিম ফুটিয়া যায় ও

বাচ্চা বাহির হয়। তা দিবার সময়ে পাখীদের আঁহার-নিদ্রা

ব্যাঙাচি।

এক-রকম বন্ধই থাকে। কিন্তু ব্যাঙের গা ভয়ানক ঠাণ্ডা; সে-জন্য তা দিবার দরকারও হয় না।

পাখীর ডিম ভাঙিলে তাহার ভিতরে এক-রকম আঠার মত সাদা ও হল্‌দে লালা দেখা যায়। এই হল্‌দে অংশটা দিয়া বাচ্চার গায়ের মাংস হাড় পালক ঠোঁট প্রভৃতির সৃষ্টি হয় এবং সাদা অংশটা গায়ে শুষিয়া লইয়া বাচ্চা ডিমের মধ্যেই বড় হয়। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, পাখীর ছানাদের খাবার ডিমের মধ্যেই থাকে। ঘোড়া ছাগল ভেড়া ও গোরুর বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য অন্য রকম ব্যবস্থা আছে। ইহারা ডিম হইতে জন্মে না, তাই গায়ে বল পাইয়া বড় হইবার জন্য ইহারা মায়ের দুধ খায়। পাখীদের মায়ের দুধ

খাইবার দরকার হয় না। ব্যাঙের বাচ্চারা ডিমের ভিতরকার পাখীর ছানাদের মতই বড় হয়। সেই ছোট ডিমের ভিতরে যে একটু লালা থাকে, তাহাই ইহারা শুষিয়া লয় এবং তাহাতেই গায়ে বল পায়। তার পরে এক দিন ডিম হইতে বাহির হইয়া কিল্-বিল্ করিয়া জলে খেলা জুড়িয়া দেয়।

মাছ কি-রকমে নিশ্বাস লয়, তোমরা বোধ হয় জানো। আমরা যেমন নাক দিয়া বাতাস টানিয়া তাহা ভিতরকার ফুস্‌ফুসে লইয়া যাই, মাছেরা সে-রকমে নিশ্বাস টানে না। ইহাদের শরীরের ভিতরে ফুস্‌ফুস্ নাই। দুই পাশে যে দুটা চাকার মত রাঙা কান্‌কো থাকে, তাহাই মাছদের নিশ্বাস টানিবার যন্ত্র। জলে সর্ব্বদাই বাতাস মিশানো থাকে, মুখ দিয়া জল টানিয়া ইহারা তাহা কান্‌কোর উপর দিয়া চালাইয়া দেয়। ইহাতে জলের বাতাস কান্‌কোর রক্তে মিশিয়া যায়। মাছেরা এই-রকমেই নিশ্বাস টানে। তাই ডাঙায় রাখিলে মাছদের দম বন্ধ হয়,—তাহারা বেশি ক্ষণ বাঁচে না। ব্যাঙাচিরা ঠিক মাছের মতই নিশ্বাস টানে। তাহাদের মাথার দুই পাশে দুটো কান্‌কো থাকে। ইহা দ্বারা জল হইতে বাতাস টানিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে। তাই ডাঙায় উঠাইলে ব্যাঙাচিরা বাঁচে না।

ব্যাঙাচিরা কুড়ি-পঁচিশ দিন জলে বাস করে। এই কয়েক দিনে ব্যাঙাচির শরীরে যে-সব পরিবর্ত্তন হয়, তাহা

বড় অদ্ভুত। ব্যাঙেরা পোকা-মাকড় ও ফড়িং খায়। ব্যাঙাচিরা তাহা খায় না। জলে যে পচা লতাপাতা থাকে, তাহাই ইহাদের খাদ্য। খাবার সুবিধার জন্য এই সময়ে ইহাদের মুখ মাথার ঠিক্ নীচে থাকে। এই মুখ দিয়া ইহারা পচা শেওলা ও ময়লা মাটি খায়। ছোট প্রাণী বলিয়া ব্যাঙাচিরা যে অল্প আহার করে, ইহা ভাবিয়ো না। ছোট অবস্থায় ইহারা দিবারাত্রি কেবল খাবারই সন্ধান করে এবং পেট ভরিয়া

পিছনের পা বাহির হওয়া ব্যাঙাচি।

খাইয়া সাত-আট দিনের মধ্যে খুব মোটা হইয়া দাঁড়ায়। এই-রকম একটা মোটা ব্যাঙাচিকে যদি কাচের গ্লাসের

জলে ছাড়িয়া পরীক্ষা কর, তাহা হইলে ইহাদের লেজের গোড়ার দুই পাশে, দুইটি উঁচু অংশ দেখিতে পাইবে,—ইহাই তাহাদের পিছনের পায়ের অঙ্কুর। দুই চারিদিনের মধ্যে সেই জায়গা হইতেই ইহাদের দু'খানি সুন্দর পা বাহির হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই মোটা লেজগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া যায়।

লেজ খসিয়া যাওয়ার পরে ব্যাঙাচিরা যখন পিছনের পায়ে জল কাটিয়া সাঁতার দেয়, তখন তাহাদিগকে ভয়ানক বিশ্রী দেখায়। ইহার পরেই তাহাদের চোখ মুখ নাক ধীরে ধীরে ঠিক ব্যাঙের মত হইয়া পড়ে, কিন্তু তখনো সম্মুখে পা দুখানি দেখা যায় না। সেই সময়ে এই পা গায়ের চামড়ার মধ্যে গজাইয়া বাড়িতে থাকে। বীজ হইতে যেমন রাতারাতি অঙ্কুর বাহির হয়, সেই-রকমে একদিন হঠাৎ গায়ের চামড়া ফাটাইয়া ব্যাঙাচির সম্মুখের পা বাহির হয়।

এই-রকমে ক্রমে ব্যাঙের চেহারা পাইলে, ব্যাঙাচিরা আর জলে থাকিতে চায় না। তখন ইহারা ডাঙায় উঠিয়া পোকা-মাকড় খাইবার জন্য সারে সারে পুকুরের পাড়ে এবং বন-জঙ্গলে বেড়াইতে আরম্ভ করে।

সাপ টিক্‌টিকি প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন আকারে বড় হয়, তেমনি গায়ের পুরানো চাম্‌ড়া শরীর হইতে খসাইয়া ফেলে। ইহাকে খোলস-ছাড়া বলে। সাপের খোলস তোমরা দেখ নাই কি? ইহাই সাপের গায়ের চামড়া। বড় হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙের গায়ের চামড়াও গা হইতে খসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহা তাহারা ফেলিয়া দেয় না,—পরম আনন্দে নিজের

লেজ-খসা ব্যাঙাচি।

গায়ের চামড়া নিজেরাই খাইতে আরম্ভ করে। ব্যাঙের মত রাক্ষুসে প্রাণী তোমরা আর কোথাও দেখিয়াছ কি?

ব্যাঙ

চৈত্র-বৈশাখ মাসের গরমের সময় যেখানে একটু ভিজে জায়গা থাকে, সেখানে সন্ধ্যার সময় দু'চারটি ব্যাঙ প্রায় দেখা যায়। তার পরে একদিন যদি খুব বৃষ্টি হয়, তবে তাহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না—গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া ডোবা ও পুকুরের জলে সমস্ত রাতই খেলা করে। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া ব্যাঙের ডাক শুনিতে মন্দ লাগে না।

আমার একটা প্রকাণ্ড পোষা ব্যাঙ ছিল। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ব্যাঙ আবার পোষ মানে! কিন্তু সত্যই সে পোষ মানিয়াছিল! সন্ধ্যার পরেই সে একটা ফুলের লতার ঝোঁপ হইতে বাহির হইত। তার পরে একটু থপ্-থপ্ করিয়া এদিক্-ওদিক্ বেড়াইয়া সদর দরজা দিয়া বাহিরে যাইত। রাত্রিতে সে আর বাড়ীতে ফিরিত না। হয় ত বন-জঙ্গলে মশা-মাছি ফড়িং খাইয়া বেড়াইত। কিন্তু ভোরে দরজা খুলিবামাত্র দেখিতাম, সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। সে আমাকে বেশ চিনিত এবং একটুও ভয় করিত না। তার পরে এক লাফে দরজা পার হইয়া বাড়ীর ভিতরে হাজির হইত। দু'বৎসর সে আমার কাছে ছিল,—শেষে এক দিন সকালে সে আর ফিরিল না। হয় ত কোনো লক্ষ্মীপেঁচা ছুঁচো বা সাপ তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক পোষা ব্যাঙটি চলিয়া যাওয়ায় বড় দুঃখ হইয়াছিল।

ব্যাঙ খুব নিরীহ প্রাণী হইলেও, দেখিতে কিন্তু ভারি বিশ্রী! ইহাদের ঘাড় বা গলা কিছুই নাই। দেহটাকে মাংসের ঢিবি বলিলেও হয়। মুখখানাও কি বিশ্রী! আকাশ-

ব্যাঙের শরীরের হাড়।

জোড়া হাঁ,—এই হাঁয়ের ভিতর দিয়া দু'পাঁচটা চড়াই পাখী পেটের ভিতরে ঢুকিতে পারে। তার পরে আবার দু'টা

প্রকাণ্ড চোখ মাথার উপরে উঁচু হইয়া থাকে,—কিন্তু আসলে মাথাটা নিতান্ত ছোট এবং ইহাদের বুদ্ধিসুদ্ধিও কম।

যদি মরা ব্যাঙ লইয়া তোমরা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাদের মুখের কেবল উপরকার চোয়ালে এক সার দাঁত আছে। অর্থাৎ তোমার মুখের নীচের দাঁতগুলি পড়িয়া গেলে তোমার যে অবস্থা হয়, ব্যাঙ সমস্ত জীবনটা সেই অবস্থায় কাটায়! তাহারা দাঁত দিয়া কোনো জিনিসই চিবাইতে পারে না। আমাদের শরীরের দুই পাঁজরে কতক-গুলি লম্বা লম্বা হাড় সাজানো থাকে, তোমরা নিজের পাঁজরে সেগুলিকে গুণিতেও পারিবে। শেয়াল কুকুর মাছ পাখী ইত্যাদি অনেক প্রাণীরই পাঁজরে এই-রকম হাড় লাগানো থাকে,—কিন্তু ব্যাঙের পাঁজরে একখানাও হাড় নাই; ইহাদের বুক ও পেট একটা মাংসের থলিবিশেষ। এই জন্যই অসম্ভব মোটা মানুষকে যেমন বিশ্রী দেখায় ব্যাঙকেও সেই-রকম বিশ্রী দেখায়।

ব্যাঙের গায়ের রঙ্‌টি কিন্তু আমার বেশ লাগে। যে-সব ব্যাঙ শুক্‌না ডাঙায় বাস করে, তাহাদের রঙ ঠিক মাটিরই মত। ধূলা বা খোঁড়া মাটির মধ্যে যখন বসিয়া থাকে, কখন ইহাদিগকে চেনাই যায় না। গেছো ব্যাঙের রঙ্‌ পাতার রঙের মতই সবুজ। আমার পোষা ব্যাঙটার পিঠে আবার চন্দনের মত লাল ছিঁটেফোঁটা ছিল। কিন্তু সোনা ব্যাঙকেই সকলের চেয়ে দেখিতে সুন্দর। কাঁচা

হলুদের মত তাহাদের গায়ের রঙ্; তার উপরে আবার কালো কালো দাগ। বেশ সুন্দর দেখায়। তোমরা দেখ নাই কি?

ব্যাঙের গায়ের চামড়া বড় মজার জিনিস। জলে ফেলিলে শুক্‌না ইট্ যেমন শোঁ শোঁ করিয়া জল টানিয়া লয়, ব্যাঙেরাও সেই-রকমে জল টানিয়া লইতে পারে। তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, নাক মুখ দিয়া ইহারা জল খাইয়া পেট ফুলায়। কিন্তু তাহা নয়, গায়ের চামড়ার ভিতর দিয়াই ইহাদের শরীরে জল প্রবেশ করে। তৃষ্ণা পাইলে আমরা মুখ দিয়া জল খাই, ব্যাঙেরা সে-রকমে জল খায় না, তৃষ্ণা পাইলেই তাহারা ঝপাৎ করিয়া পুকুরের জলে লাফাইয়া পড়ে এবং সমস্ত গা দিয়া জল টানিয়া ফুলিয়া উঠে। এই-জন্যই জলে বা ভিজে জায়গায় যাইতে না দিলে সাধারণ ব্যাঙ তৃষ্ণায় মারা যায়। শুক্‌না জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখিলে দু'চার দিনের মধ্যে তাহারা শুকাইয়া খুব ছোট হইয়া যায়; কিন্তু ছাড়া পাইয়া একবার জলে ডুব দিতে পারিলে ফুলিয়া ঠিক্ আগেকার মতই বড় হইয়া পড়ে। গা ভিজে রাখিবার জন্যই ব্যাঙেরা কূয়ো ও পুকুরের ধারের ভিজে জায়গায় আড্ডা করে।

ব্যাঙের পা চারিখানি তোমরা ভালো করিয়া দেখিয়াছ কি? ইহাদের পায়ের আঙুলগুলি হাঁসের আঙুলের মত পাৎলা চামড়া দিয়া জোড়া। তাই ইহারা অনায়াসে সাঁতার দিতে পারে। কিন্তু সাম্‌নের পা এবং পিছনের পা, ঠিক্ এক

রকম নয়। পিছনের পা এবং তাহার আঙুল ভয়ানক লম্বা। এই পা গুটাইয়া এবং তাহারি উপরে জোর দিয়া ব্যাঙেরা লাফ্ দেয়। ইহাদের পিছনের পায়ে পাঁচটা করিয়া আঙুল থাকে, কিন্তু সাম্‌নের পায়ে চারিটার বেশি আঙুল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্যাঙদের সবই যেন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।

ব্যাঙেরা কি খায় তোমরা জানো কি? মাছি মশা পিঁপ্‌ড়ে, এমন কি কেঁচোও ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা পায় না। নিরামিষ খাবার ইহাদের মুখে একেবারে রুচেই না। অন্য প্রাণীরা পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের খাবার খায়,—ব্যাঙেরা জিভ দিয়া শিকার টানিয়া মুখে পোরে। জিভটাও বড় অদ্ভুত। আমাদের জিভের আগা থাকে সাম্‌নে। কিন্তু ব্যাঙের জিভের গোড়াটা সাম্‌নে এবং আগাটা গলার ভিতরে ছড়ানো থাকে। এই লম্বা জিভটার গায়ে আবার আঠার মত এক-রকম জিনিস লাগানো থাকে। জিভের আঠায় একবার জড়াইয়া গেলে মশা মাছি ফড়িং কেহই পলাইতে পারে না।
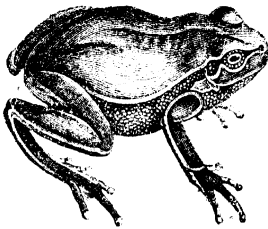
ব্যাঙ্।

তোমরা ব্যাঙের শিকার ধরা দেখ নাই কি? আমার

সেই পোষা ব্যাঙটিকে অনেকবার শিকার ধরিতে দেখিয়াছি। শিকারের সময়ে ব্যাঙের বীরত্ব দেখিলে সত্যই হাসি পায়। একটা মাছি বা পিঁপ্‌ড়েকে দেখিলেই ব্যাঙ-মহারাজ বীর-পুরুষের মত সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া পড়ে, তখন এক সেকেণ্ডের জন্যও সে শিকার ছাড়া আর কোনো দিকেই তাকায় না। এই সময়ে সেই পিঁপ্‌ড়ে বা মাছিটা যদি একটু নড়ে, তবে আর রক্ষা থাকে না। তখন ব্যাঙ তাহার সেই লম্বা আঠা-মাখানো জিভ দিয়া শিকার ধরিয়া মুখে পূরিয়া দেয়! সে এত শীঘ্র জিভ বাহির করিয়া শিকার ধরে যে কখন কি হইল কিছুই বুঝা যায় না। শিকারটা বোধ হয় পেটের ভিতরে গিয়া জানিতে পারে যে, তাহাকে ব্যাঙে খাইয়াছে।

শিকার মুখে পূরিয়া ব্যাঙ যে কাণ্ড করে, তাহা আরো মজার। তখন সে থপাস্ করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া পড়ে এবং ড্যাবা-ড্যাবা চোখ দুটো বুজিয়া এক-দুই-তিন করিয়া চার-পাঁচটা ঢোক্ গেলে। আমরা যখন রসগোল্লা খাই তখন তাহা একটু চিবাইয়াই এক ঢোকে গিলিয়া ফেলি; যদি খুব ভালো লাগে, তবে না-হয় আরাম করিবার জন্য চোখ বুজিয়া আর একটা ঢোক্ দিই। ব্যাঙেরা একটা পিঁপ্‌ড়ে বা মাছি গিলিবার সময় আমাদের রসগোল্লা খাওয়ার চেয়েও বোধ হয় বেশি আরাম পায়। আমরা যখন ঢোক্ গিলি, তখন আমাদের কেবল গলার উপরটাই কাঁপে, কিন্তু ব্যাঙেরা ঢোক্

গিলিবার সময়ে মাথা হইতে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত কাঁপায়। ব্যাঙের এই-সব কাণ্ড দেখিলে হাসি পায় না কি?

নিশ্বাস না লইলে ডাঙার কোনো প্রাণীই বেশি ক্ষণ বাঁচে না। তোমরা যদি নিজেদের পাঁজরে হাত দিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের পাঁজরের হাড়গুলি উঠা-নামা করিতেছে। ইহাতে অনায়াসে বাইরের বাতাস শরীরের ভিতরে যায় এবং তার পরে ভিতরের বাতাস বাইরে আসে। কিন্তু ব্যাঙের নিশ্বাস টানাও অদ্ভুত। তাহাদের শরীরে পাঁজরার হাড় নাই, এ-কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কাজেই আমাদের মত বুক্ ফুলাইয়া তাহারা নিশ্বাস লইতে পারে না। প্রথমে মুখে বাতাস জমা করে, তার পরে মুখ বন্ধ করিয়া তাহারা আমাদের ভাত গেলার মত কোঁৎ-কোঁৎ করিয়া বাতাস গেলে। ইহাই ব্যাঙের নিশ্বাস লওয়া। বড় মজার ব্যাপার নয় কি? তোমরা যদি একটা ব্যাঙকে কয়েক মিনিট লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, তাহার গলার কাছটা একটু-একটু কাঁপিতেছে। তখন মনে হয়, বুঝি ব্যাঙটা ডাকিবে, তাই তার গলা কাঁপিতেছে। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়,—উহা বাতাস গেলারই কাঁপুনি। নাক দিয়া বাতাস টানিয়া ব্যাঙেরা মুখ বুজিয়া তাহা গিলিয়া ফেলে।

তোমরা হয় ত এখন ভাবিতেছ, একটা ব্যাঙকে যদি কিছু ক্ষণ হাঁ করাইয়া রাখা যায়, তবে বুঝি সে মরিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে ব্যাঙ মরে না। নাক দিয়া নিশ্বাস

না লইয়াও ব্যাঙ অনেক দিন বাঁচে। ইহাদের গায়ের চামড়া প্রায়ই ভিজে-ভিজে থাকে ; এই ভিজে চামড়ার ভিতর দিয়া ব্যাঙেরা অনায়াসে বাহিরের বাতাস শরীরের ভিতরে লইয়া যাইতে পারে।

আমরা রাত্রিতে কতটুকুই বা ঘুমাই। হয় ত সাত বা আট ঘণ্টা। কিন্তু ব্যাঙেরা ঘুমায় দুই তিন মাস। প্রায় কুম্ভ-কর্ণের ঘুমের মত। তোমরা ব্যাঙের ঘুম দেখ নাই কি ? গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে খুব বড় বড় পোকা-মাকড় খাইয়া যখন ইহারা খুব মোটা-সোটা হয়, তখন শীতকাল আসে। শীতকালে পোকা-মাকড় মরিয়া যায়, এবং যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারা গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহির হয় না। এই শীতকালটাই ব্যাঙদের ঘুমের সময়। ঘুম পাইলে আর রক্ষা থাকে না,—তখন কেহ পুকুরের পাঁকের তলায়, কেহ পচা লতা-পাতার নীচে শুইয়া পড়ে এবং ঘুম সুরু করে। সমস্ত শীতকালটা যে কি-রকমে কাটিয়া গেল, ইহারা ঘুমে অচেতন থাকিয়া তাহার কোনো খবরই রাখে না। একটু শব্দ হইলে বা বাড়ীর কুকুরটা একটু জোরে চেঁচাইলে আমাদের ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু ব্যাঙের ঘুম বজ্রপাতের শব্দে বা পঁচিশটা ঢাক বাজাইলেও ভাঙে না। এমন কি কোনো রকমে মাথাটা থেঁৎলাইয়া গেলে বা একখানা পা ছিঁড়িয়া গেলেও ঘুমের শেষ হয় না। ঘুমের সময়ে তাহারা নিশ্বাসটা পর্য্যন্ত লয় না। সমস্ত শীতকাল এই-রকমে মড়ার মত ঘুমাইয়া ফাল্গুন মাসে ব্যাঙেরা জাগিয়া উঠে।

আধ মিনিট নিশ্বাস না লইলে আমাদের হাঁফ্ লাগে এবং এক বেলা না খাইলে ছট্‌ফটানি ধরে। দুই তিন মাস নিশ্বাস না লইয়া এবং কিছু না খাইয়া ব্যাঙেরা কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস টানিয়া লই, তাহাই আমাদের শরীরকে গরম রাখে। ব্যাঙের শরীর এবং রক্ত একটুও গরম নয়। হঠাৎ পায়ের উপরে ব্যাঙ লাফাইয়া পড়িলে, তাহার গা কি-রকম ঠাণ্ডা লাগে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? রক্ত ঠাণ্ডা বলিয়াই ইহাদের বেশি নিশ্বাস টানার দরকার হয় না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে-একটু বাতাসের দরকার হয়, তাহা উহারা গায়ের চামড়া দিয়াই টানিয়া লয়। খুব মোটা মানুষ এবং খুব পাৎলা মানুষ,—এই দু'জনকে যদি অনাহারে রাখা যায়, তবে পাৎলা লোকটাই শীঘ্র কাতর হইয়া পড়ে। মোটা মানুষের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শরীর খারাপ হয় না। কেন এ-রকম হয়, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। মোটা মানুষের শরীরে অনেক চর্ব্বি জমা থাকে, তাহাই ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া শরীরের তাপ রক্ষা করে। মোটা মোটা ব্যাঙগুলো যখন দুই তিন মাস ধরিয়া অনাহারে ঘুম দেয়, তখন গায়ের চর্ব্বিই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে।

মাছ

রুই কাত্‌লা কই মাগুর চিতল বোয়াল—কত রকমেরই মাছ আমরা দেখিতে পাই। ইহারা কি খায়, কি-রকম করিয়া চলা-ফেরা করে এবং ইহাদের শরীরই বা কি-রকমের সেই-সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

জলে আধ মিনিট ডুব দিয়া থাকিলে আমাদের কি-রকম হাঁফ লাগে তোমরা দেখ নাই কি? কেবল মানুষ নয়, কুকুর বিড়াল গোরু ছাগলও কিছুক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকিলে হাঁফাইয়া পড়ে এবং শেষে মরিয়া যায়। বন্যার জলে পড়িয়া এই-রকমে যে কত গোরু ঘোড়া ছাগল এবং মানুষ ডুবিয়া মরে, তাহার সংখ্যাই হয় না। কিন্তু মাছগুলো দিবারাত্রি জলে ডুবিয়া থাকিয়াও মরে না,—ডাঙায় উঠিলেই তাহারা মারা যায়। এটা খুব আশ্চর্য্যের কথা নয় কি?

জীবজন্তুরা কিছু না খাইয়া দু'চার দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু শরীরের ভিতর বাতাস না টানিয়া কোনো প্রাণীই বেশি দিন বাঁচে না। আমরা কি-রকমে শরীরের ভিতরে বাতাস টানিয়া লই, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। নাক দিয়া বাতাস টানিয়া আমরা তাহা বুকের ভিতরকার ফুস্‌ফুসে চালান করি। সেখানে যে রক্ত চলাচল করে তাহা ঐ বাতাসে সাফ হয়। এই-সব কাজ হইয়া গেলে বাতাসটুকুকে আমরা আবার নিশ্বাসের সঙ্গে শরীর হইতে বাহির করিয়া

দিই। বাতাসের এই রকম আনাগোনা দিবারাত্রিই ডাঙার প্রাণীদের শরীরে চলে। কিন্তু মাছেরা এ-রকমে নিশ্বাস টানে না,—তাহারা বাতাস লয় জলেরই ভিতর হইতে। তাই তাহারা জলে ডুবিয়াও মরে না।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ,—সে আবার কি কথা। জলের ভিতরে কি-রকমে বাতাস থাকিবে? কিন্তু বাতাস সত্যই জলের ভিতরে থাকে। জলে ডুবাইলে যেমন শুক্‌না কাপড় খানিকটা জল টানিয়া লয়, জলও সেই-রকমে চারি পাশ হইতে অনেকটা বাতাস শুষিয়া রাখিতে পারে। ইহা জলেরই একটা প্রধান গুণ। চায়ের জল গরম করিবার সময়ে কেট্‌লির ভিতরে যে চোঁ-চোঁ শব্দ হয়, তাহা তোমরা শুন নাই কি? জলে যে বাতাস মিশানো থাকে, তাহা গরম হইয়া যখন বাহির হইতে চায় তখনি ঐ-রকম শব্দ করে। যাহা হউক, মাছেরা জলের ভিতরকার এই বাতাসই দেহে টানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মাছেরা জলশুদ্ধ বাতাস নাক দিয়া টানিয়া বুকের ভিতরে চালান করে। কিন্তু তাহা নয়। ইহাদের নিশ্বাস লইবার যন্ত্রটি বড় মজার এবং নিশ্বাস টানাও অদ্ভুত। ইহারা কখনই আমাদের মত ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করিয়া নিশ্বাস ফেলে না। মাছের মাথার পিছনে দুই দিকে দুটা ঢাকনি-ওয়ালা কৌটার মত ছিদ্র আছে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? ইহাকে কান্‌কোর ছিদ্র বলে। মাছের

নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র দুইটা এই কৌটার ভিতরেই থাকে। টাট্‌কা মাছের কান্‌কোর ঢাক্‌নি উঠাইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে তাহার ভিতরে জিলাপির মত গোলাকার এবং চিরুণীর দাঁতের মত ফাঁক ফাঁক কয়েক থাক্ লাল রঙের কান্‌কো সাজান আছে। এইগুলিই মাছের ফুস্‌ফুসের কাজ করে। অন্য প্রাণীদের শ্বাসযন্ত্র শরীরের ভিতরে এমন করিয়া লুকানো থাকে যে, তাহা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু মাথার দুপাশের কৌটার ঢাক্‌নি খুলিলেই মাছদের শ্বাসযন্ত্র নজরে পড়ে। টাট্‌কা মাছের কান্‌কো দেখিতে লাল,—যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সত্যই তাই,—ইহাদের কান্‌কোর উপর দিয়া রক্ত চলাচল করে। মাছেরা মুখ দিয়া জল টানিয়া প্রথমে তাহা কান্‌কোর উপরে ফেলে। তার পরে কান্‌কোর উপরকার রক্ত জলে-মিশানো বাতাস টানিয়া লইলে, সেই জলটুকু তাহারা কান্‌কোর ঢাক্‌নি খুলিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহাই মাছের নিশ্বাস লওয়া।

একটি বড় বোতলে দু'টা ছোট খলিসা বা কই মাছ রাখিয়া পরীক্ষা করিলে তোমরা মাছের নিশ্বাস লওয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। দেখিবে, মাছগুলি যেন মুখ দিয়া ঢোকে-ঢোকে ক্রমাগত জল গিলিতেছে। আমরা তোমাদের মত যখন ছোট ছিলাম, তখন ইহাকে মাছের জল খাওয়াই ভাবিতাম। কিন্তু তাহা নয়,—ইহাই মাছের নিশ্বাস লওয়া। এই-রকমেই জল টানিয়া তাহারা কান্‌কোর উপর দিয়া চালায় এবং

কান্‌কোর রক্ত জলের বাতাস শুষিয়া লইলে, সেই জল কান্‌কোর ঢাক্‌নি খুলিয়া ছাড়িয়া দেয়। মাছেরা কি-রকমে কান্‌কোর ঢাক্‌নি খোলে বোতলের মাছে তোমরা তাহাও দেখিতে পাইবে।

আমাদের গা-হাত-পা স্বভাবতই গরম তাহা তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। যে প্রাণী যত ঘন ঘন নিশ্বাস লয় তাহাদের গা ততই গরম হইয়া পড়ে। তুমি খুব দৌড়াইয়া আসিয়া যখন হাঁফাইতে থাকো, তখন নিজের গায়ে নিজেই হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, তোমার গায়ের তাপ আগেকার চেয়ে নিশ্চয়ই অধিক হইয়াছে। পাখীরা খুব ঘন ঘন নিশ্বাস টানে,—ইহাদের গা সর্ব্বদাই ভয়ানক গরম থাকে। সাপ ব্যাঙ টিক্‌টিকি গিরগিটিরা খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস লয়, এজন্যই ইহাদের গা গরম হয় না,—গায়ে ঠেকিলে ইহাদিগকে জলের মত ঠাণ্ডা জিনিস বলিয়াই বোধ হয়। মাছেরা জল হইতে একটু-একটু বাতাস টানিয়া কোনোগতিকে বাঁচিয়া থাকে,—তাই ইহাদের দেহ আরো ঠাণ্ডা। তোমরা যদি একটা জ্যান্ত মাছের মুখের ভিতরে আধ ঘণ্টা ধরিয়া একটা থার্‌মোমিটার পূরিয়া রাখ, তবে তাহার পারা এক ডিগ্রিও উপরে উঠিবে না।

শরীরের গরম যাহাতে গা হইতে বাহির হইয়া না যায়, তাহার জন্য জগদীশ্বর প্রাণীদের শরীরে নানা সুব্যবস্থা রাখিয়াছেন। গোরু ছাগল কুকুর প্রভৃতির গা লোমে ঢাকা

থাকে, তাই গরম জামার মত উহা শরীরের তাপ শরীরেই আট্‌কাইয়া রাখে। পাখীর গায়ে যে পালক লাগানো থাকে, তাহাও ঐ কাজ করে। সাপ ব্যাঙ টিক্‌টিকি প্রভৃতির গায়ে তাপ নাই, কাজেই তাপ রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের লোমের দরকার হয় না। মাছের গা ঠাণ্ডা,—এই জন্যই ইহাদের গায়ে লোম নাই। মাছের গায়ে যে আঁশ লাগানো থাকে, তাহা গায়ের তাপ রক্ষার জন্য নয়। আঘাত লাগিলে বা পরস্পর কামড়া-কামড়ি করিলে, যাহাতে গায়ে চোট্ না লাগে তাহারি জন্য ইহাদের গা আঁশে ঢাকা থাকে।

মাছের গায়ে আঁশগুলি কি-রকমে সাজানো থাকে তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? ইহাদের গায়ের চামড়ায় আমাদের জামার পকেটের মত অনেকগুলি থলি থাকে এবং প্রত্যেক থলিতে এক-একটা আঁশ গোঁজা থাকে। তাই মাছের গা হইতে আঁশ খসিয়া পড়ে না। ইহাদের গা যদি আঁশে ঢাকা না থাকিয়া বিলাতি কুকুরের মত লম্বা লোমে ঢাকা থাকিত, তাহা হইলে ইহাদের জলে সাঁতার দেওয়াই মুস্কিল হইত। তোমরা তাজা মাছের গায়ে হাত বুলাইয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, এক-রকম লালার মত তেলা জিনিস সকল মাছেরই গায়ে মাখানো রহিয়াছে। গাড়ীর চাকায় তেল লাগানো থাকিলে তাহা যেমন চট্‌পট্ ঘোরে, ঐ তেলের মত জিনিসটা গায়ে লাগানো থাকে বলিয়া মাছেরা অনায়াসে জলের মধ্য দিয়া চলিতে পারে।

মাছের গায়ে হাড়গুলি কি-রকমে সাজানো আছে দেখিবার ইচ্ছা হইলে তোমরা একটা বড় পুঁটিমাছকে পিঁপ্ড়ের গাদায় ফেলিয়া রাখিয়ো, দেখিবে, এক দিনের মধ্যেই পিঁপ্ড়েরা মাছের গায়ের মাংস খাইয়া কেবল হাড়-গুলিকেই ফেলিয়া রাখিয়াছে। মাছের মেরুদণ্ড অর্থাৎ শিরদাঁড়া বড় মজার জিনিস—কতকগুলি কাঁটাওয়ালা খণ্ড খণ্ড হাড় দিয়া ইহা নির্ম্মিত। এগুলির প্রত্যেকটির দুই পাশে বাটির মত দু'টা করিয়া গর্ত্ত থাকে। একই মাপের দুটী বাটি মুখে মুখে জোড়া দিলে যেমন বলের মত একটা ফাঁপা গোলাকার জিনিস হয়, মাছদের শিরদাঁড়ার হাড়গুলি যখন জোড়া থাকে তখন প্রত্যেক জোড়ের মুখ ঐ-রকম এক-একটি ছোট বলের মত হইয়া দাঁড়ায়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই সকল ফাঁপা ছোট বল্ বুঝি খালিই থাকে। কিন্তু তাহা নয়; ইহাদের প্রত্যেকটিই তেলের মত এক-রকম জিনিসে ভর্ত্তি থাকে। জোড়ের মুখে এই তেলের মত জিনিস আছে বলিয়াই মাছেরা তাহাদের সমস্ত শরীরটাকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া জলে সাঁতার দিতে পারে। মাছেরা কি-রকম ভঙ্গিতে শরীর বাঁকাইয়া জলের ভিতরে চলা-ফেরা করে, তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। বোতলে-পোরা মাছ পরীক্ষা করিয়ো,—ইহাদের সাঁতার দিবার ভঙ্গি দেখিতে পাইবে।

পাখীদের শরীরে দু'খানা ডানা থাকে এবং পিছনে একটা ছোট লেজ থাকে। এইগুলি দিয়া ইহারা অনায়াসে

বাতাস কাটিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। জল কাটিয়া সাঁতার দিবার জন্য মাছদের শরীরে ডানা আছে। মাছের ডানা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ কিন্তু সবশুদ্ধ কতগুলি ডানা আছে, তাহা বোধ হয় গুণিয়া দেখ নাই। যদি না দেখিয়া থাক, তবে তোমাদের বাড়ীতে এবারে যখন বড় মাছ আসিবে, তখন ডানাগুলি পরীক্ষা করিয়ো।

সাধারণ রুই কাত্‌লা প্রভৃতি মাছের দুই কান্‌কোর নীচে দুইটা ডানা থাকে,—তার পরে পেটের নীচে দুইটা এবং লেজের কাছেও একটা ডানা থাকে। কিন্তু সব চেয়ে বড় ডানাটা থাকে শিরদাঁড়ার উপরে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এই-সব মাছের শরীরে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়খানি ডানা থাকে। তা'ছাড়া ইহাদের লেজাগুলোও কতকটা ডানারই কাজ করে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মাছের এতগুলো ডানার প্রয়োজন কি? যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, সকল ডানারই প্রয়োজন আছে। মাঝিরা পিছনকার একটা দাঁড়ে মোচড় দিয়া কি-রকমে নৌকা চালায়, তোমরা দেখ নাই কি? মাছের লেজটা ঠিক্ এই-রকমেই দাঁড়ের ও হালের কাজ করে। জলের ভিতরে চলিবার সময়ে মাছেরা লেজাটাকেই মোচড় দিয়া এপাশ-ওপাশ করে এবং ইহাতেই তাহাদের সম্মুখের দিকে গতি হয়।

যদি অনেক ক্ষণ জলে ডুব দিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে

আমাদের মাথাগুলো ক্রমে নীচের দিকে যায় এবং পা উপরে উঠে। জলে ডুব দিয়া থাকিয়া আমরা অনেকবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমাদের মাথাগুলি দেহের অন্য অংশের চেয়ে বেশি ভারি বলিয়াই ইহা হয়। মাছের পিঠে মেরুদণ্ড থাকে, এজন্য তাহাদের পিঠটাই সকল অঙ্গের চেয়ে বেশি ভারি। কাজেই সাঁতার দিবার সময়ে তাহাদের পিঠ নীচের দিকে এবং পেট উপরের দিকে থাকারই কথা। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, কান্‌কোর নীচেকার এবং পেটের তলাকার ডানাগুলি নাড়িয়াই মাছেরা পিঠ উপরে রাখিয়া সাঁতার দেয়। মরা মাছ পুকুরের জলে কি-রকমে ভাসে, বোধ হয় তোমরা সকলে দেখ নাই। সুবিধা পাইলে পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, মরা মাছের পিঠ নীচে এবং পেট উপরে আছে। মরিয়া গেলে মাছ ডানা নাড়িয়া পিঠ উপরের দিকে রাখিতে পারে না,—এই জন্যই ঐ প্রকার ঘটে।

সকল মাছেরই যে ছয়খানা করিয়া ডানা আছে, তাহা নয়। কই মাছ পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, তাহার পিঠের প্রায় আগাগোড়াই ডানা। এই ডানায় আবার ছুঁচের মত ধার থাকে। ইলিস মাছের ডানা খুবই নরম, কিন্তু জিয়ল ও মাগুর মাছের ডানায় বড় বড় কাঁটা জোড়া থাকে। ইহারা এই-সব কাঁটা দিয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করে।

কই ও কাত্‌লা মাছের পেটে এক একটা পট্‌কা থাকে, তোমরা ইহা দেখ নাই কি ? ইহা ফুট্‌বলের ব্লাডারের মত এক-রকম জিনিস—সর্ব্বদাই এক-রকম বাষ্পে ভরা থাকে। রুই মাছে এ-রকম দু'টা ব্লাডার গায়ে-গায়ে জোড়া
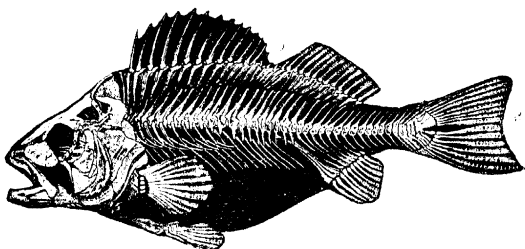
কই জাতীয় মাছের ডানা ও হাড়।

দেখিতে পাইবে। মাছেরা এইগুলি লইয়া কি কাজ করে, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না। যখন গভীর জল হইতে উপরে উঠিতে চায় তখন মাছেরা পট্‌কার মধ্যে বাষ্প ভরিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহা ফুলিয়া উঠিয়া শরীরটাকে খুব হাল্‌কা করিয়া দেয়। কাজেই তখন মাছ অনায়াসে হুস্‌ করিয়া উপরে উঠিতে পারে। মজার ব্যাপার নয় কি ? তার পরে যখন উপরকার জল হইতে মাছেরা নীচেকার জলে নামিতে চায় তখন ইহারা পট্‌কার ভিতরকার বাতাস সঙ্কুচিত করে। কাজেই তখন

শরীরটা ভারি হইয়া যায় এবং তাহারা চট্ করিয়া নীচে নামিয়া পড়ে।

মাছেরা কি খায়, এখন সেই কথাটা তোমাদিগকে বলিব। একজন মানুষ যদি আর একজনকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে রাক্ষস বলি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, মাছদের মধ্যে সকলেই রাক্ষস। পরস্পরকে কামড়াইয়া খাইয়া অধিকাংশ মাছই জীবন ধারণ করে। তোমরা হয় ত ভাবো, মাছেরা জলের ভিতর সাঁতরাইয়া বুঝি খুব সুখে থাকে। কিন্তু আসলে তাহা নয়, নিজেদেরই আত্মীয় গোষ্ঠীর কে কখন্ ঘাড়ে কামড় দেয়, ইহা ভাবিয়া তাহারা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে। ডাঙার প্রাণীরা যেমন বাঘকে ভয় করে, জলের প্রাণীরা তেমনি বোয়াল ও চিতল মাছকে ভয় করে। অন্য মাছ কখনো কখনো জলের ভিতরকার পচা গাছপালা ও ছোট পোকামাকড় খায়, কিন্তু গণ্ডায় গণ্ডায় ছোট মাছ না খাইলে বোয়াল ও চিতলদের পেট ভরে না।

আমাদের চোখ কান নাক আছে, মাছদেরও আছে। তোমরা মাছের চোখ কান ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, মাছের চোখে পাতা নাই; আমরা যেমন চোখ বুজিতে পারি, মাছেরা কোনোক্রমে তাহা পারে না। ঘুমাইবার সময়েও ইহারা চোখ মেলিয়া ঘুমায়। তা' ছাড়া আমাদের মত ইহারা কখনই দূরের

জিনিস দেখিতে পায় না। জলের মধ্যে সমস্ত জিনিসই অস্পষ্ট দেখায়, এজন্য ইহাদের দূরের জিনিস দেখিবার প্রয়োজনও হয় না।

চোখের পাশেই তোমরা মাছদের দুইটা করিয়া নাকের ছিদ্র দেখিতে পাইবে। এক-একটা ছিদ্রে আবার জোড়া-জোড়া গর্ত্ত থাকে। তাহা হইলে বলিতে হয়, মাছের নাকের ছিদ্র চারিটি। আমাদের নাকের ছিদ্রের সহিত গলার নলের যোগ আছে। এই জন্যই হঠাৎ নাকে জল প্রবেশ করিলে তাহা গলায় গিয়া পৌঁছে। কিন্তু মাছদের নাকের সঙ্গে মুখের একটুও যোগ নাই। ইহাদের নাকের গর্ত্ত মাথায় আসিয়া শেষ হয়। নাক দিয়া নিশ্বাস টানে না বলিয়াই মাছের নাক এমন সৃষ্টি-ছাড়া।

আমাদের কানের গর্ত্ত বাহির হইতেই দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্ব শরীর খুঁজিয়াও মাছের কান বাহির করিতে পারিবে না। মাছের কান থাকে, তাহাদের মাথার হাড়ের মধ্যে, এই লুকানো কান দিয়া ইহা আমাদের চেয়েও ভালো শুনিতে পায়।

মাছের দাঁত তোমরা দেখ নাই কি? ইহাদের দাঁত-গুলি আমাদের দাঁতের মত নয়। ছোট কাঁটার মত অনেক দাঁত মাছের মুখে লাগানো থাকে এবং সেগুলিকে আবার গলার দিকে বড়সির মত বাঁকানো দেখা যায়। আমরা যেমন খাবার জিনিস দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া চিবাইয়া খাই, মাছেরা

কোনো জিনিসই সে-রকমে খায় না। ঐ-সকল দাঁত খাবার জিনিসকে চাপিয়া ধরিবার সময়ে কাজে লাগে। মাছের জিভগুলোতেও দাঁতের মত ছুঁচালো ছোট ছোট কাঁটা বিছানো থাকে। শিকার ধরিবার সময়ে ইহা দাঁতেরই কাজ করে।

এক-একটা মাছের পেটে কত ছোট ছোট ডিম থাকে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই সব ডিম জলে ছাড়িয়া দিয়াই মাছেরা নিশ্চিন্ত হয়। কিছু দিন পরে যখন সে-গুলি হইতে ছোট বাচ্চা বাহির হয়, তখনো তাহারা নিজের বাচ্চাদের খবর লয় না। মাছের অনেক বাচ্চাই সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি জলের জানোয়ারের পেটে যায়,—এমন কি যদি দু'দশটা বাচ্চা খেলা করিতে করিতে মুখের গোড়ায় আসিয়া হাজির হয়, তবে মা-ও তাহাদিগকে খাইতে ছাড়ে না। এই রকমে মাছের অধিকাংশ বাচ্চাই নষ্ট হইয়া গেলে যে দুই চারিটি বাঁচিয়া থাকে সেইগুলিই ক্রমে বড় মাছ হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, মাছের বাচ্চাদের জন্য সত্যই বড় দুঃখ হয়,—বাপ মা জ্ঞাতি কুটুম্ব সাপ ব্যাঙ মানুষ সকলেই তাহাদের শত্রু।

আমাদের খাদ্য

ঠিক্ সময়ে খাবার না পাইলে কি-রকম কষ্ট হয়, তাহা তোমরা জানো। তখন ক্ষুধায় পেট জ্বালা করিতে থাকে, কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না, এবং মেজাজও ভয়ানক খারাপ হয়। তার পরে যেই কিছু খাওয়া যায়, অমনি শরীর ও মন সুস্থ হয়। আমাদের পেটে এই-রকম ক্ষুধার উৎপাত কেন থাকে, তোমরা বোধ হয় তাহা জানো না।

তোমরা রেলের গাড়িতে বা অন্য কোনো জায়গায় যে-সব এন্‌জিন্ দেখিয়াছ, আমাদের শরীরগুলা ঠিক্ সেই-রকম এন্‌জিনেরই মত। এন্‌জিন্ যেমন ঘর্-ঘর্ শব্দ করিয়া চলে, আমাদের শরীরের ভিতর-বাইরের নানা অংশ ঠিক্ সেই-রকমেই চলিতেছে। তুমি যখন দৌড়াইয়া বেড়াও, খুব চীৎকার করিয়া পড়া মুখস্থ কর বা বুদ্ধি খরচ করিয়া অঙ্ক কসিতে থাকো, তখন এই কাজগুলা তোমার শরীরের কলেই করায় নাকি? তাহা হইলে দেখ, আমাদের শরীর এবং এন্‌জিনের কলের বিশেষ কোনো তফাৎ নাই।

কল চালাইতে গেলে, তাহার ভিতরে কয়লা বা তেল পোড়াইয়া আগুন জ্বালিতে হয়। এই-সব আগুনের জোরে যেমন কল চলে, তেমনি গায়ের জোরেই তোমরা লাফালাফি ও দৌড়াদৌড়ি কর। কিন্তু গায়ের জোর অমনি আসে না। আমরা যে ভাত ডাল রুটি তরকারি খাই তাহাই কলের

আগুনের মত আমাদের গায়ে জোরের সৃষ্টি করে। যখন এন্‌জিনের আগুন নিভিয়া যায় তখন কল চলে না। খালাসিরা যেই তাড়াতাড়ি উননে রাশি-রাশি কয়লা ঢালিয়া দেয়, অমনি কল্ তুম্-দাম্ করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। পেটে যখন খাবার থাকে না, তখন আমাদের শরীরের অবস্থাও কতকটা সেই-রকমই হয়। তখন কলগুলো আর চলিতে চায় না,—একটু দৌড়াইতে গেলে হাঁফাইয়া পড়িতে হয় এবং একটু চিন্তা করিতে গেলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। তখন শরীরের কল পেটে ক্ষুধা জাগাইয়া কেবল খাবারই চাহিতে থাকে। তাই তখন খাবার খাইলে আমাদের পেটের জ্বালা দূর হয়, শরীরে বল ফিরিয়া আসে এবং মনটাও ঠাণ্ডা হয়।

কলের হাঙ্গামা অনেক। একজন মিস্ত্রি কলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহার কোনো জায়গা খারাপ হইলে, সে তখনি তাহা সারিয়া দেয়। তা'ছাড়া অনেক দিন চলিতে চলিতে যখন কলের কোনো অংশ ক্ষয় পায়, তখন তাহা বদ্‌লাইয়া দেয়। ইহা না করিলে কল বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের শরীরের কলেও ঠিক্ এই-সকল ঘটনাই ঘটে। ইহারো ক্ষয় আছে। আমরা যে খাবার খাই, তাহা হইতে রক্ত হয় এবং সেই ক্ষয়ের পূরণ করে। তা'ছাড়া আমাদের শরীরকে বাড়াইবার জন্যও খাবারের দরকার। তুমি চারি বৎসর আগে যেমন ছোট ছিলে, এখন কি ঠিক্ সেই-রকমটিই

আছ? কখনই না। তোমার চারি বৎসর আগেকার জামা-গুলো এখন তোমার গায়ে লাগিবে না; সে সময়ের জুতো পায়ে দিতে গেলে, তাহা পায়ে যাইবে না। মাসে-মাসে বৎসরে-বৎসরে তোমরা বাড়িয়াই চলিয়াছ। আমরা যাহা খাই, তাহারই সারবস্তু আমাদের দেহের হাড়গুলিকে মোটা ও লম্বা করে এবং শরীরে মাংস জমাইয়া সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বড় করিয়া তোলে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, কেবল পেটের জ্বালা থামাইবার জন্য আমরা আহার করি না। শরীরকে গরম করিয়া বল পাইবার জন্য এবং শরীরের ক্ষয় পূরণ করিয়া বড় হইবার জন্য আমরা ডাল ভাত রুটি তরকারি খাই।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, পেট ভরিয়া এক গাদা ভাত বা এক বাটি ডাল খাইলেই তাহাতে শরীরের সব কাজ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা হয় না। আমরা যে-সব জিনিসকে খাদ্য বলি, তাহাদের প্রত্যেকটি পেটে গিয়া হজম হইলে পৃথক্-পৃথক্ কাজ করে। যে-খাবার শরীর গরম রাখে, তাহা কখনই দেহের হাড় বা মাংসের সৃষ্টি করে না। আবার যে-সকল খাবার শরীরের ক্ষয় পূরণ করে, তাহা কখনই শরীরের শক্তি বাড়ায় না। একজন চাকর রাখিয়া তাহাকে দিয়া লেখাপড়ার কাজ, সহিসের কাজ, রান্নার কাজ, ঘর তৈয়ারির কাজ এবং জুতা সেলাইয়ের কাজ করানো যায় কি? খাবার সম্বন্ধে ঠিক্ এই কথাই বলা যায়,—এক-রকম

খাবারে আমাদের শরীরের সব অভাব মিটে না। কোনো খাবার শরীরকে গরম রাখে, কেহ হাড় ও মাংসের সৃষ্টি করে, কেহ আবার শরীরকে বল দেয়। এইজন্যই ভাতের সঙ্গে আমাদিগকে তেল ঘি দুধ প্রভৃতি নানা খাদ্য খাইতে হয়,—না খাইলে শরীর খারাপ হইয়া যায়। আমরা এই-সম্বন্ধেই তোমাদিগকে কিছু বলিব।

দুধ হইতে কি-রকমে ছানা প্রস্তুত হয়, তোমরা বোধ হয় সকলে তাহা দেখ নাই। গরম দুধে একটু ছানার জল দিলেই দুধে জলের ভাগ পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে দলা-দলা ছানা ভাসিতে থাকে। ছানার জল কাছে না থাকিলে, লেবুর রস বা ফিট্‌কারীর জল দিলেও দুধ হইতে ছানা পৃথক্ হইয়া পড়ে। ছানা জিনিসটি আমাদের শরীরের পরম উপকারী। ইহা আমাদের দেহে মাংসের সৃষ্টি করে এবং তাহার ক্ষয় পূরণ করে। জন্মের সময় হইতে দুই তিন মাসের মধ্যে শিশুরা কত শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়, তোমরা দেখ কি? তখন মনে হয় যেন, খোকাটি দিনে-দিনে বড় হইতেছে। মায়ের দুধ এবং গোরুর দুধই শিশুদের প্রধান আহার। দুধমাত্রেই ছানাজাতীয় জিনিস অনেক থাকে,—তাহা খাইয়াই উহারা এত শীঘ্র বড় হয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, যে-সব গরিব লোক দুধ বা ছানা খাইতে পায় না, তাহারা বুঝি বড় হয় না। কিন্তু তাহা নয়। মাছ মাংস ডাল এবং ময়দাতে ছানাজাতীয়

জিনিস অনেক থাকে, কিন্তু তাহা ছানার আকারে থাকে না। এই-সকল জিনিস খাইলে ঠিক্ ছানা খাওয়ারই ফল পাওয়া যায়। যাহারা মাছ মাংস দুধ খায় না, তাহাদের বেশি ডাল খাওয়া খুবই উচিত,—ইহাতে ছানাজাতীয় জিনিস, মাছ ও মাংসের মতই বেশি থাকে। ভাতে ঐ জিনিসটি অতি অল্প থাকে,—শাক-সব্জি তরি-তরকারিতেও বেশি থাকে না। ফল-মূলের মধ্যে কেবল নারিকেল ফুলকপি কচু কড়াইসুঁটি সীম কলা প্রভৃতিতে ছানাজাতীয় জিনিস একটু বেশি দেখা যায়।

ঘি এবং তেল আমরা প্রতিদিনই অনেকটা করিয়া খাই, —এই দুটি জিনিস ছাড়া আমাদের কোনো খাবারই মুখে ভালো লাগে না। তেল ও ঘি পেটে পড়িয়া কি কাজ করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না,—এইগুলিই আমাদের শরীরকে গরম রাখে। বেশি ঘি খাইলে মানুষ মোটা হইয়া পড়ে, এই-রকম কথা অনেকে বলে। কিন্তু তাহা ঠিক্ নয়। পরিমাণমত ঘি তেল খাইলে গায়ের জোর বাড়ে এবং বেশি খাইলে গায়ে চর্ব্বি জমে।

তেল ঘি ও দুধের এই-সব গুণের কথা শুনিয়া তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, ভাত না খাইলেও বুঝি চলে। কিন্তু তা' নয়। তেল ও ঘিয়ের মতই ইহা শরীরকে গরম রাখে এবং গায়ে বল দেয়। তোমরা যে চিনি ও গুড় খাও, তাহাও পেটে গিয়া ঐ কাজ করে। খুব মোটা হইবে মনে করিয়া তোমরা যদি ক্রমাগত পেট ভরিয়া ভাত আলু এবং চিনি

খাইতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে ভয়ানক ভুল করিবে। এগুলি কখনই শরীরে মাংসের সৃষ্টি করে না।

আমাদের সকল খাবারেই একটু-আধটু লবণজাতীয় জিনিস মিশানো থাকে। একটা আলু বা কপির পাতাকে উনানের আগুনে পোড়াইয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, সমস্ত জিনিসগুলি পুড়িয়া একটুখানি ছাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাই লবণজাতীয় পদার্থ। মাছ মাংস ফল দুধ তাজা তরকারি প্রভৃতি সকল রকম খাদ্যেই ইহা সামান্য পরিমাণে থাকে। সামান্য হইলেও এই জিনিস হইতে আমরা যে উপকার পাই, খাদ্যের অন্য অংশ হইতে তাহা পাওয়া যায় না। প্রাণিমাত্রেরই শরীরের হাড় এই লবণজাতীয় জিনিসেই পুষ্ট হয়। তরকারির মধ্যে ওল কাঁচা-কলা প্রভৃতিতে লবণজাতীয় জিনিস বেশি থাকে।

খাবারের জন্য আমাদের বাড়ীতে প্রতিদিন কত আয়োজনই হয়। ডাল তরকারি ঘি দুধ তেল চিনি দিয়া প্রস্তুত রকম রকম সুখাদ্য আমাদের পেটে পড়ে। আমরা যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম, তখন ভাবিতাম,—মা কেন এত খাবারের আয়োজন করেন? এক বাটি ডাল, কয়েক গ্রাস ভাত খাইলেই পেট ভরিয়া যায়। এই রকম ভাবা যে কত ভুল, বোধ হয় এখন তোমরা তাহা বুঝিয়াছ। কেবল একটা জিনিস খাইলে পেট ভরে বটে, কিন্তু শরীর যাহা চায় তাহা ঐ-রকম খাবার হইতে পাওয়া যায় না।

অন্য কিছু না খাইয়া তোমরা যদি পরামর্শ করিয়া একমাস ধরিয়া কেবল ভাতই খাইতে থাক, তবে দেখিবে, খাওয়ার দোষেই তোমাদের শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যাইতেছে। তার পরে ভাত ত্যাগ করিয়া যদি কিছুদিনের জন্য তোমরা বাটি বাটি ডাল চুমুক দিয়া খাইতে স্বরু কর তাহা হইলে দেখিবে, শরীর মোটা হইতেছে বটে, কিন্তু গায়ের জোর কমিয়া আসিতেছে। যাহা শরীরকে গরম রাখে ও দেহে বল জোগায় সে জিনিসটা ডালে খুবই অল্প থাকে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, কেবল এক-রকম খাদ্য আমাদের শরীরের পক্ষে ভালো নয়। যাহাতে শরীরে বল হয়, যাহাতে মাংসের সৃষ্টি হয় এবং যাহাতে আমাদের শরীরের হাড়গুলি পুষ্ট হয়,—এই তিন রকমের খাদ্যই প্রতিদিন আমাদের দরকার। একটি খাদ্যের দ্বারা তিনটি কাজই এক সঙ্গে হয় না,—তাই আমাদের নানা খাদ্যের প্রয়োজন।

শরীরের বিষ

সাপের দাঁতের গোড়ায় বিষ আছে; বোল্‌তার হুলের বিষও অতি ভয়ানক। কুকুর শেয়াল ক্ষেপিলে তাহাদের মুখের লালায় বিষ হয়। তাই ক্ষ্যাপা কুকুরে কামড়াইলে মানুষ মারা যায়। এ-সবই তোমরা জানো। কিন্তু তোমার ও আমার শরীরে সর্ব্বদাই যে ভয়ানক বিষ জন্মিতেছে, তাহার কথা তোমরা শুনিয়াছ কি? বোধ হয় শুন নাই,—এখানে সেই বিষের কথাই বলিব।

একজন খুব বড় ডাক্তার কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—আমাদের শরীরে প্রতিদিন যে বিষ জন্মিতেছে, তাহা শরীর হইতে বাহির হইয়া না গেলে, রাম-মূর্ত্তি বা স্যাণ্ডোর মত খুব বড় পালোয়ানও এক দিনে মারা যায়। তোমরা বোধ হয়, কথাটা বিশ্বাস করিতেছ না,—কিন্তু ইহা সত্য। প্রতি মিনিটেই আমাদের শরীরে বিষ জন্মিতেছে। যাহাতে সেই বিষ তাড়াতাড়ি শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা আমাদের দেহে আছে। এই জন্যই আমরা বাঁচিয়া আছি।

বিষ নষ্ট করিবার যত যন্ত্র আমাদের শরীরে আছে, তাহর মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌ এবং লিভার অর্থাৎ যকৃৎই প্রধান। আমাদের শরীরের কোন্‌ জায়গায় ফুস্‌ফুস্‌ আছে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো। বুকের পাঁজরার মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌ থাকে। নিশ্বাস লইবার সময়ে আমরা নাক দিয়া যে বাতাস টানি তাহা

ফুস্‌ফুসে গিয়া ফুস্‌ফুসকে ফুলাইয়া তোলে। ইহাতে নিশ্বাস টানার সময়ে আমাদের বুকও ফুলিয়া উঠে। তোমরা বুকের পাশের দুই পাঁজরে হাত দিয়া জোরে নিশ্বাস টানিয়া পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, পাঁজর ফুলিয়া উঠিয়াছে। শরীরের ভিতর দিয়া সর্ব্বদাই রক্তের স্রোত চলিতেছে। স্রোতের জল যেমন নদীর ময়লা-মাটি ধুইয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেয়, তেমনি শরীরের মধ্যে যে-সব বিষ জমা হয়, তাহা রক্তই ধুইয়া আনিয়া আমাদের হৃদ্‌পিণ্ডে জমা করে। তার পরে সেই ময়লা রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যে পৌঁছিলে আমাদের নিশ্বাসের বাতাসে তাহা শোধন হইয়া যায়। দূষিত জিনিসকে শোধন করিলে তাহার যে ময়লা-মাটি আবর্জ্জনা থাকে সেগুলিকে পৃথক্ করিয়া ফেলা দরকার,—তাহা না হইলে যে জিনিসকে শোধন করা গেল তাহা আবার খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং রক্তের শোধন হইলে যে-সব আবর্জ্জনা শরীরে জমা হয়, তাহা বাহির করা দরকার হয়। কি উপায়ে এগুলি শরীরের বাহিরে আসে, তাহা তোমরা বোধ হয় জানো না। নিশ্বাস ফেলিবার সময়ে
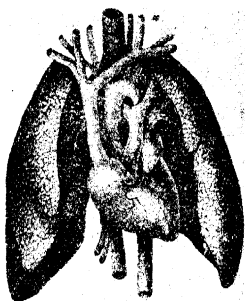
মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুস্।

যে বাতাস আমাদের ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বাহির হয়, তাহাই ঐ-সব আবর্জ্জনা শরীরের বাহিরে আনে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আমাদের নিশ্বাস ফেলার বাতাসটা ভালো বাতাস নয়,—তাহার সঙ্গে অনেক খারাপ জিনিস মিশানো থাকে। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া একই ঘরে যদি অনেক লোক গাদাগাদি করিয়া বাস করে, তাহা হইলে এই-জন্যই ঘরের বাতাস খারাপ হয়। এই বাতাসে আমাদের নিশ্বাস টানার কাজ চলে না।

যকৃৎ অর্থাৎ লিভার আমাদের শরীরের কোন্‌ জায়গায় আছে, তোমরা বোধ হয় জানো। আমাদের পেটের ডান ধারে যকৃৎ থাকে। এই যন্ত্রটি বড়ই অদ্ভুত। ইহা শরীরের যে কত উপকার করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এইযন্ত্র নিজে বিষ উৎপন্ন করে, আবার অন্য বিষকে নষ্ট করে; তা' ছাড়া নানা রকম জারক রস উৎপন্ন করিয়া আমরা যাহা খাই তাহা হজম করে। একটা

যকৃৎ ও পিত্তকোষ।

ছোট যন্ত্রে যখন এক সঙ্গে এতগুলো কাজ চলে, তখন সত্যই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তারেরা নানা জন্তুর যকৃৎ কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হইতে কি-রকমে এতগুলি কাজ চলে তাঁহারা ঠিক জানিতে পারেন নাই।

মাছের শরীরের ভিতরে যে পিত্তের থলি আছে, তাহা বড় মাছ কুটিবার সময়ে হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। খুব পাৎলা চামড়ার এই থলিটা যকৃতের গায়ে লাগানো থাকে এবং তাহার ভিতরে এক রকম গাঢ় হলুদ রঙের রস থাকে,—ইহাই পিত্তরস। এই জিনিসটা ভয়ানক তিত। পিত্ত গলিয়া গিয়া যদি কোটা মাছের গায়ে লাগে, তবে সে মাছ ভয়ানক তিত হয়। তাই মাছ কুটিবার সময়ে পিত্তের থলি সাবধানে কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

মানুষের যকৃতেও ঐ-রকম পিত্তের থলি আছে এবং তাহাতে পিত্ত-রস জমা হয়। এই রসটা কি কাজ করে, তোমরা বোধ হয় জানো না। আমরা যদি দুধ জল বা অন্য খাবারের সঙ্গে কোনো বিষ খাইয়া ফেলি, তবে যকৃৎ সেই বিষ টানিয়া লয় এবং তাহারি কতকটা দিয়া পিত্তরসের সৃষ্টি করে এবং বাকি বিষ নিজের কাছে আট্‌কাইয়া রাখে। কাজেই সামান্য রকমের বিষ খাইলে, তাহা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু বিষের পরিমাণ বেশি হইলে, তাহার সবটা যকৃতে আট্‌কায় না।

তখন বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং তাহাতে মানুষ মারা পড়ে।

সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে। তুমি যে ছুরিখানা দিয়া প্রতিদিনই পেন্‌সিল ও কলম কাটিয়া থাক, দু'বছর পরে দেখিবে তাহার ফলা ক্ষয় পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। ঘস্-ঘস্ করিয়া যখন কল চলে, তখন তাহারো লোহা প্রভৃতি ক্ষয় পায়। এই সব ক্ষয়ের জন্য যে ময়লা জমে তাহা, কলের মিস্ত্রি তেল দিয়া এবং ন্যাক্‌ড়া দিয়া মুছিয়া ফেলে। ইহা না করিলে কল বিগ্‌ড়াইয়া যায়। আমাদের শরীরের কলেও ঠিক্ ইহাই ঘটে। চলার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কলের মত আমাদের শরীরের কলেরও ক্ষয় হয় এবং এই ক্ষয়ের আবর্জ্জনা শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তাহা না করিলে ব্যারাম দেখা দেয় এবং ইহাতে মানুষ মারা যায়। দেহের ক্ষয়ে শরীরের ভিতরে যে আবর্জ্জনা জমা হয়, তাহা ভয়ানক বিষ। রক্ত হইতে এই বিষ টানিয়া লইয়া বাহির করা আমাদের যকৃতেরই আর একটা কাজ।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, নর্দ্দামা দিয়া যেমন পচা ময়লা মাটি আবর্জ্জনা বাহির হয়, যকৃতের ভিতর দিয়া বুঝি সেই-রকমেই শরীরের আবর্জ্জনা বাহির হয়। কিন্তু উহা সেই-রকমে হঠাৎ বাহির হয় না। যকৃতে আট্‌কাইয়া আবর্জ্জনা-গুলির কতক অংশ প্রথমে পিত্ত-রসের আকৃতি পায়, তার পরে তাহা শরীরের অন্য কাজ করিয়া মলের সহিত বাহিরে

আসে। তেল, ঘি, মাখন, চর্ব্বি প্রভৃতি জিনিস হজম করা কঠিন। ঐ পিত্তরস দিয়াই যকৃৎ ঐ-সব খাদ্যকে হজম করে এবং পেটের ভিতরে আরো যে বিষাক্ত জিনিস থাকে সেগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের যকৃৎ প্রতিদিনই আধ সের হইতে তিন পোয়া পর্য্যন্ত পিত্তরসের সৃষ্টি করে। বিষ হইতে যে জিনিসের সৃষ্টি, তাহা কখনই ভালো জিনিস হইতে পারে না। বিষ হইতেই পিত্তরসের সৃষ্টি হয় বলিয়া—ইহা ভয়ানক বিষাক্ত। তাই ইহা তাড়াতাড়ি শরীর হইতে বাহির হইয়া না গেলে, আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করে।

পিত্তরস প্রস্তুত করার পরেও যে-সব বিষ বা আবর্জ্জনা বাকি থাকে, তাহা আর একটি জিনিসে পরিণত হয়। এই জিনিসটির ইংরেজি নাম ইউরিয়া। ইহা মূত্রাশয়ের ভিতর দিয়া শরীরের বাহিরে আসে। এই জন্যই প্রাণীদের মূত্রাশয় জখম হইলে ভয়ানক বিপদ ঘটে। তখন গায়ের সমস্ত রক্ত শরীরের বিষে পূর্ণ করিয়া উঠে,—ইহাতে প্রাণী একদিনের মধ্যেই মারা পড়ে।

তাহা হইলে দেখ,—দাঁতে বিষ আছে বলিয়া আমরা সাপ বিছে কুকুর শেয়ালকেই যে দোষ দিই, তাহা ঠিক নয়। আমাদের শরীরের ভিতরেও দিবারাত্রি বিষের সৃষ্টি হইতে[illegible] যকৃৎ মূত্রাশয় ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি দিয়া সেগুলি বাহির হই[illegible] বলিয়াই আমরা সুস্থ থাকি। তাহা না হইলে [illegible] নিজেদের বিষেই নিজেরা মারা পড়িতাম। মদ খাইয়া

সব দেশেই হাজার হাজার লোক মরে। কি-রকমে মরে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। মদ জিনিসটা ভয়ানক বিষ। ইহা পেটে পড়িয়া রক্তের সঙ্গে মিশিলে প্রথম প্রথম লিভারই তাহা টানিয়া রাখে এবং পিত্তরস বা মূত্রের আকারে শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু মদের বিষে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলে যকৃৎ আর সে কাজটি করিতে পারে না। তখন রক্তের সঙ্গে মিশিয়া এই মদই মানুষকে মারিয়া ফেলে। কখনো কখনো দিবারাত্রি মদের বিষ লইয়া কাজ করায় যকৃৎ দুর্ব্বল হইয়া যায় এবং তখন তাহাতে ফোড়া হয়। এই রোগেও অনেক লোক মারা যায়।

সমাপ্ত